জুন ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আমার পরিবেশ আমার ভালোবাসা

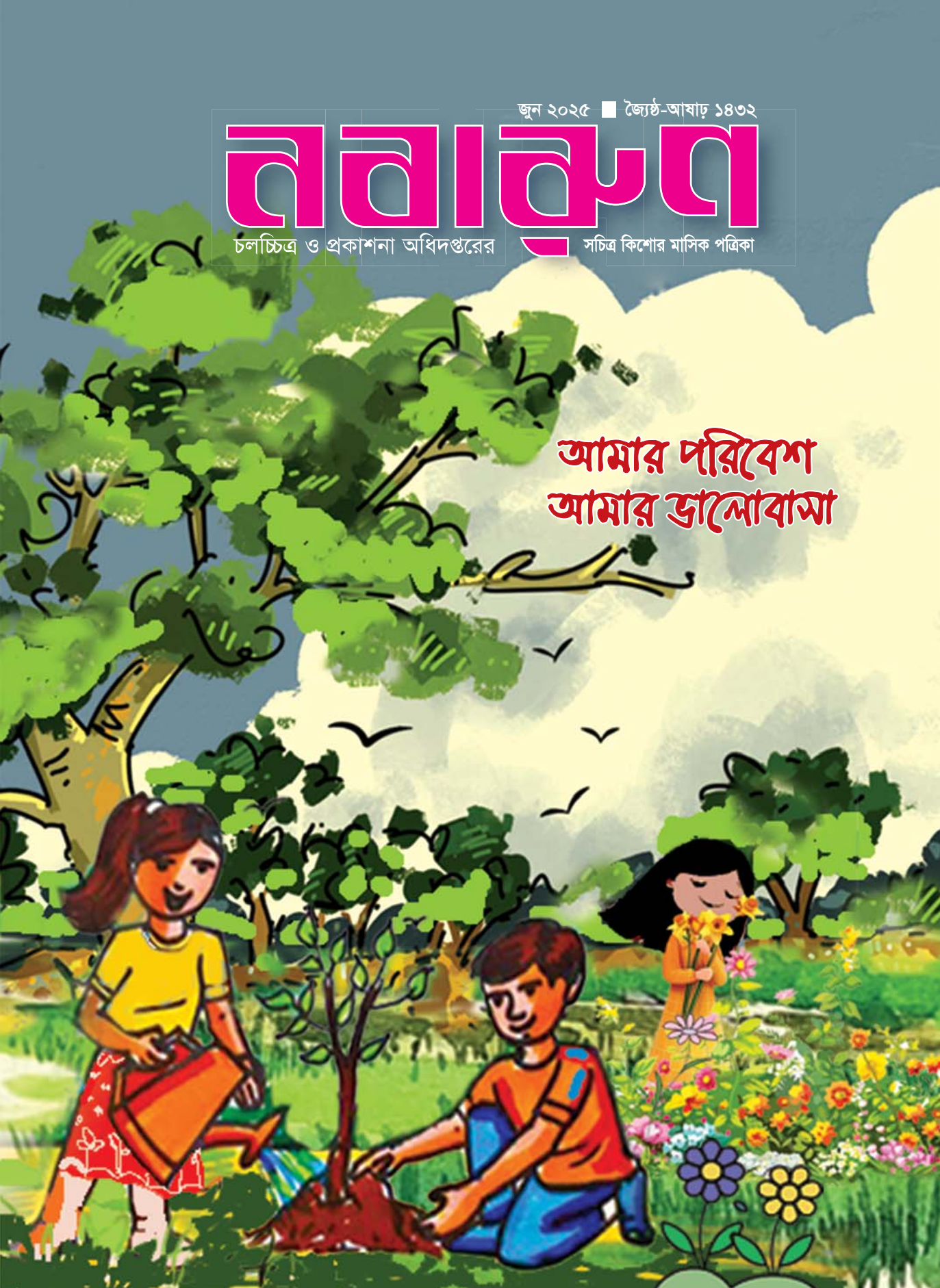

রুনা খান, সপ্তম শ্রেণি, রাজধানী আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

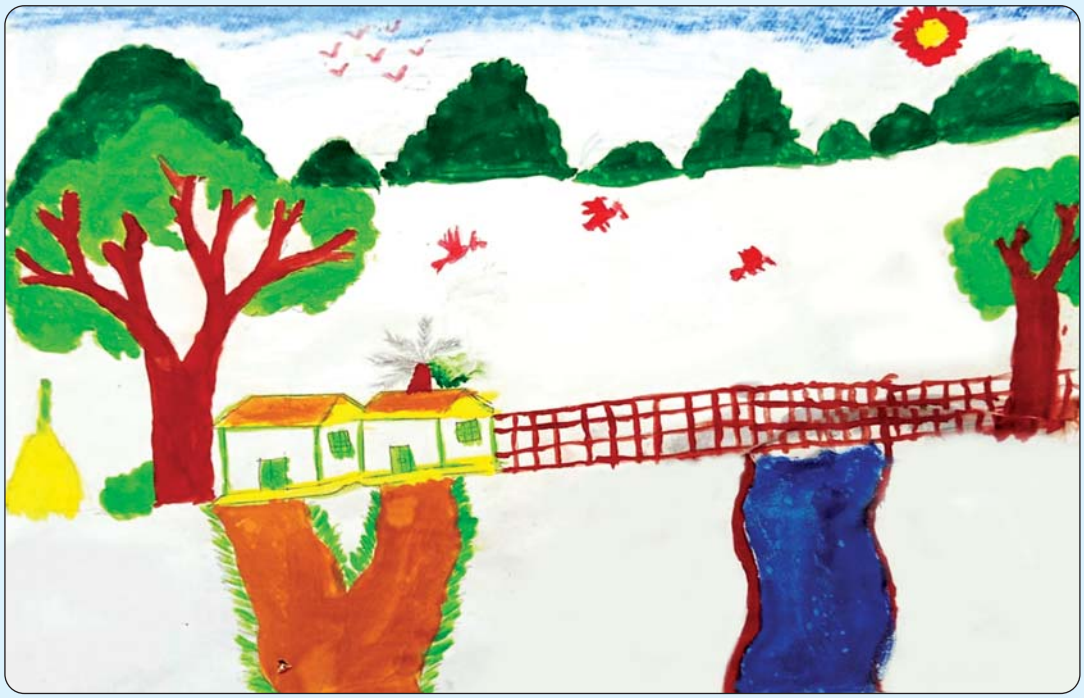

জান্নাত আক্তার তানহা, পঞ্চম শ্রেণি, প্যারাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

সম্পাদকীয়

পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ৫ই জুন পালিত হয় 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা আয়োজনে এ দিবসটি পালন করা হয়। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) নেতৃত্বে ১৯২৭ সাল থেকে সারা বিশ্ব প্রতি বছর ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। আমাদের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য সুস্থ-সুন্দর পরিবেশের বিকল্প নেই।

বন্ধুরা, পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিবেশ সুরক্ষায় সবাইকে কাজ করতে হবে। আমরা তাই নিজ নিজ জায়গা থেকে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট থাকব। পরিবেশকে সুরক্ষা দেয় গাছ। গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাই বাড়ির আঙিনা, স্কুলের আশপাশে কিংবা যেখানে খালি জায়গা রয়েছে, আমরা সেখানে বেশি বেশি গাছ লাগাবো।

১৫ই জুন 'বিশ্ব বাবা দিবস'। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে এ দিবসটি পালন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্বের ১১১টি দেশে জুন মাসের তৃতীয় রোববার পালিত হয় 'বাবা দিবস'। বাবা হলেন আমাদের জীবনে এক সুপার হিরো। আমরা এ দিনে তো বটেই, সারা বছরই বাবাকে সম্মান জানাবো আর ভালোবাসবো হৃদয় উজাড় করে।

ভালো থেকো, আনন্দে থেকো, নবারুণের সাথেই থেকো।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ পরিবেশ সংবেদনশীল শিশু/ মুহা. শিপলু জামান
২৪ বাবা দিবসের কথা/ মো. ইকবাল হোসেন
৪৯ ঈদ এবং আমাদের নারী উদ্যোক্তা/ অদিতি রিতু
৫২ ফলে ভরা গ্রীষ্মকাল/ মনিরা বেগম মিমি
৫৭ ৪০০ বছরের গাছ/ শফিউল্লাহ সুমন

গল্প

০৭ আমাদের ছোটো নদী/ এনায়েত রসুল
১২ ডাস্টবিনের দুঃখ/ মুহিব্বুল্লাহ কাফি
২১ বাঘারামের পিঠে মিউমিউ/ পঙ্কজ শীল
২৬ গরু নিয়ে গণ্ডগোল/ জুয়েল আশরাফ
৩০ গম ও ধানের কথা/ শাহীন পরদেশী
৩২ 'ব' তে বাবা/ মো. মোকাদ্দেস আলী
৩৪ টিফিন বক্সে ভূতের চিপস/ শায়লা শারমিন মীরা
৩৭ হরিণ ছানার ক্ষমা/ নাঈমুল হাসান তানযীম
৪১ দাদার কোরবানি/ আব্দুস সালাম
৪৪ জিন পরিদের আস্তানা/ আবদুল লতিফ
৪৭ আইসক্রিম ভূত/ রকিবুল ইসলাম

কল্পবিজ্ঞান গল্প

১৫ বু বু বু/ নাসরীন মুস্তাফা

কবিতাগুচ্ছ

১৪ জাফরুল আহসান
৩৬ মো. মাসুদুর রহমান
৪০ আজহার মাহমুদ
৪৩ মো. কামরুজ্জামান/ আলাউদ্দিন আল-আউয়াল
৫৩ সুশান্ত কুমার দে

ছোটোদের ছড়া

২৫ মো. আবরার হাসান
৩৬ মো. সজিব হোসেন
৪০ মো. কাউসার আহমেদ
৪৬ নাজমুস সাদাত

প্রতিবেদন

৫৪ ৩১ বার এভারেস্ট জয়ের বিশ্বরেকর্ড/ আরিফুল ইসলাম
৫৫ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৮ খাগড়াছড়ির নিউজিল্যান্ড/ ওবায়েদুর রহমান
৫৯ কুইলিং: এক কাগজের খেলা/ জান্নাতে রোজী
৬০ দশদিগন্ত/ সাবা তাসনিম
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : রুনা খান/ জান্নাত আক্তার তানহা
তৃতীয় প্রচ্ছদ : মো. হাসিবুল ইসলাম/ সারিকা তাসনিম নিধি
শেষ প্রচ্ছদ : মায়মুনা সানজিদা
৫৬ মাইশা আক্তার
৬৩ ফয়সাল আহমেদ
৬৪ রিজওয়ান আল রাহাত/ শারদ দাস

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

পরিবেশ সংবেদনশীল শিশু

মুহা. শিপলু জামান

আজকের শিশু একটি দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি, পরিচালক বা নেতা। ভবিষ্যতে আমরা কেমন দেশ, কেমন প্রজন্ম, কেমন সভ্যতা পাবো তা অনেকাংশেই নির্ভর করে বর্তমান শিশুদের সঠিক পরিচর্যা, লালনপালন আর সুশিক্ষার ওপর; যা তাদের পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শিশুদের যত্ন, খাওয়াদাওয়া এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিতের দায়িত্ব তাদের মা-বাবা, পরিবার পরিজন ও শিক্ষকের। শুধু এই বিষয়গুলোই নয়, তাদের পূর্ণ বিকাশে প্রয়োজন নিরাপদ পরিবেশ - পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক। একটি শিশু তার পরিবার ও সমাজে স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে এবং নিরাপদে বেড়ে উঠবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। পাশাপাশি শিশুদের হতে হবে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল ও আন্তরিক।

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা অপরিসীম। জন্মের পর থেকে শিশুর চারপাশের পরিবেশই তার বেড়ে ওঠার অন্যতম নিয়ামক। কিন্তু বর্তমান সময়ে শহুরে ব্যস্ততা, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রা এবং খেলার জায়গার অভাব শিশুর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ছোটোবেলায় ভালো পরিবেশ পেয়েছে, তারা আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান ও সফল ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। অপরদিকে, যেসব শিশু দারিদ্র্য, অবহেলা বা সহিংসতার মধ্যে

বড়ো হয়, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হলে তাকে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে।

যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে আর শিক্ষার প্রসারে শিশুদের সঠিক বিকাশে আমরা আগের তুলনায় অনেক সজাগ ও সচেতন। তবে প্রাকৃতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন সমস্যা ও রোগবালাই যা শিশুদের মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, সে সম্পর্কে সকলকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। এজন্য শিশুদের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধেও সকলকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন শুধু শিশুদের নয় সমগ্র মানবজাতির জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ কাজে শিশুদেরকে যুক্ত করতে হবে। পরিবেশ, প্রতিবেশ, বাস্তুসংস্থান, খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের জানাতে ও শেখাতে হবে।

প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দিবসটি পালনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষ যাতে এই পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সমস্ত জীবের সাথে একাত্ম হয়ে একটি সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ই জুন অবধি জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment) শুরু হয়েছিল। সম্মেলনটি ইতিহাসের প্রথম পরিবেশ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের স্বীকৃতি পায়।

১৯৭৪ সালে সম্মেলনের প্রথম দিন জাতিসংঘ ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতি বছরই দিবসটি আলাদা শহরে, আলাদা প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হয়। এ বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে দিবসটির আয়োজক হলো কোরিয়া প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'প্লাস্টিক দূষণ আর নয়', স্লোগান হলো 'প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনি সময়'। এদিন পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের প্রভাবের উপর ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তুলে ধরা হয় এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রত্যাখ্যান, হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্বিবেচনার গতি বৃদ্ধির ওপর জোর প্রচারণা চালানো হয়।

পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম, যদিও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই নগণ্য। তা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ কাজে শিশুদেরকেও সাথে রাখতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্লাস্টিক একটি অভিশাপ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। প্লাস্টিকের অসচেতন ও অবিবেচিত ব্যবহারের ফলে দেশের শহর ও গ্রাম সবখানেই ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত। প্লাস্টিকের কারণে শহরে পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি মুখ থুবড়ে পড়ছে, জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে, গ্রামে ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে, নদীর তলদেশে প্লাস্টিক আধিক্যের কারণে নদী নাব্যতা হারাচ্ছে এবং মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। আর এজন্য আমাদের প্রয়োজন একটি পরিবেশবান্ধব প্রজন্ম যারা এখন থেকেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও টেকসই পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকবে এবং এ লক্ষ্যে কাজ করবে। তবে এর শুরুটা করতে হবে পরিবার থেকে, যেন আমাদের সন্তানদের পরিবেশবান্ধব বা প্রকৃতিপ্রেমী হিসেবে গড়ে তুলে।

পরিবেশবান্ধব সন্তান গড়ে তুলতে আমরা যা যা করতে পারি;

১. ছোটোকাল থেকেই শিশুদের প্রকৃতি ও পরিবেশ, জীবজন্তু, পশুপাখির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া

২. শিশুদের গাছ লাগানোর এবং গাছের পরিচর্যা করার অভ্যাস করতে অনুপ্রাণিত করা

৩. বিভিন্ন রকম জীবজন্তু ও পশুপাখির প্রতি যত্নশীল ও সহমর্মী হতে শেখানো

৪. শিশুকে নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া, ছোটোবেলা থেকেই হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা বা সাইকেল চালানো অর্থাৎ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন যানবাহন যতটা সম্ভব পরিহার করা

৫. খাবার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি অপচয় না করার শিক্ষা দেওয়া

৬. লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কাগজের অপচয় না করা, তাদের জানাতে হবে যে গাছ কেটে কাগজ তৈরি হয়

৭. বাসা থেকেই যতটা সম্ভব প্লাস্টিক বর্জন করা, বিশেষ করে শিশুকে প্লাস্টিকের কোনো পাত্রে খেতে না দেওয়া

৮. রিসাইকেল করা উপাদান বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি খেলনা অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব উপাদান দিয়ে খেলতে দেওয়া ইত্যাদি।

তবে শুধুমাত্র ছোটোদের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করলেই হবে না, বাবা-মাসহ পরিবারের সকলকেই পরিবেশের প্রতি দরদ ও সহমর্মিতা দেখাতে হবে, মেনে চলতে হবে পরিবেশবান্ধব নিয়মগুলো। কেননা, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তারা তাই করার চেষ্টা করে যা বড়োরা চর্চা করে। সুতরাং পরিবর্তন শুরু করতে হবে নিজ থেকে, পরে তা অন্যকে শেখাতে হবে। চলুন, আমরা প্রতি বছর অন্তত নিজে একটি করে গাছ লাগাই এবং শিশুদের এ কাজে উৎসাহ প্রদান করি। যে-কোনো অনুষ্ঠান-উৎসবে বইয়ের পাশাপাশি গাছ হোক অন্যতম উপহার। বাড়ির ছাদ, আঙিনা, অফিসের করিডোর কিংবা বারান্দা অথবা ড্রয়িং রুমে গাছ হোক আমাদের সাজসজ্জার প্রধান অনুষঙ্গ। প্লাস্টিক বা পলিথিন আমাদের নিত্যদিনের কাজে ওতপ্রোতভাবে

জড়িয়ে আছে, আমরা পলিথিনে অভ্যস্ত এমনকি আসক্ত বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় রেখে এর ব্যবহার যথাসম্ভব সীমিত করতে হবে এবং এক পর্যায়ে বন্ধ করতে হবে। সোনালি আঁশের (পাট) দেশ - বাংলাদেশ। পাটের তৈরি ব্যাগ হতে পারে পলিথিনের উত্তম বিকল্প, এছাড়া কাগজ ও কাপড়ের তৈরি ব্যাগও ব্যবহার করা যায়। পাটের ব্যাগ একদিকে পরিবেশবান্ধব অন্যদিকে এই ব্যাগ ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে পাট শিল্পের উন্নয়ন ঘটবে। প্লাস্টিক বা পলিথিনের রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহার করার অভ্যাসও গড়তে হবে।

এছাড়া পানি, বাতাস, মাটি ইত্যাদির দূষণ আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছে। ফলে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস, খড়াসহ নানাবিধ দুর্যোগ ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করে পরিবেশ দূষণের কারণ চিহ্নিত করতে হবে এবং তা রোধে নারী-পুরুষ-শিশুসহ সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। যে-কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মকাণ্ড শুরু করার আগে পরিবেশের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে এবং সে ক্ষতি কমানো বা পূরণে কেমন পদক্ষেপ নিতে হবে তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে।

নবারুণের লেখক ও পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমার এই লেখার মাধ্যমে আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সকলে পরেবেশ দূষণ রোধে সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণ করি এবং তা ছড়িয়ে দেই দেশের সকল প্রান্তরে। সর্বোপরি বলি, আসুন শিশুদের পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তুলি। ❑

পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশান), ডিএফপি

তথ্যসূত্র :

https://www.khaborerkagoj.com/religion/858392

https://www.prothomalo.com/lifestyle/enbjy1nvtc

গল্প

আমাদের ছোটো নদী

এনায়েত রসুল

প্রতিদিন সকালে এক কাপ কফি আর একটা খবরের কাগজ না হলে আমার চলে না। আজও কাগজ আর কফি নিয়ে বসেছি, সে সময় চোখ পড়ল নদীর ওপর। জানালার পাশে বসে আছে সে।

নদী আমার নাতনি। সবেমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে। অথচ এরই মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে আমাকে বিপদে ফেলে দেওয়ার কাজে সে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। গতকালের কথাই বলি– বারান্দায় বসে আছি। সে সময় নদী এসে বলে, একটা প্রশ্নের জবাব দাও। চার পা নিয়ে একটা ঘোড়া পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে ছুটতে পারে। কিন্তু একগাদা পা নিয়েও শুঁয়োপোকারা ধীরে ধীরে ছোটে! এর কারণ কী?

আমি বলি- কারণটা আমার জানা নেই। জেনে তোকে জানাবো।

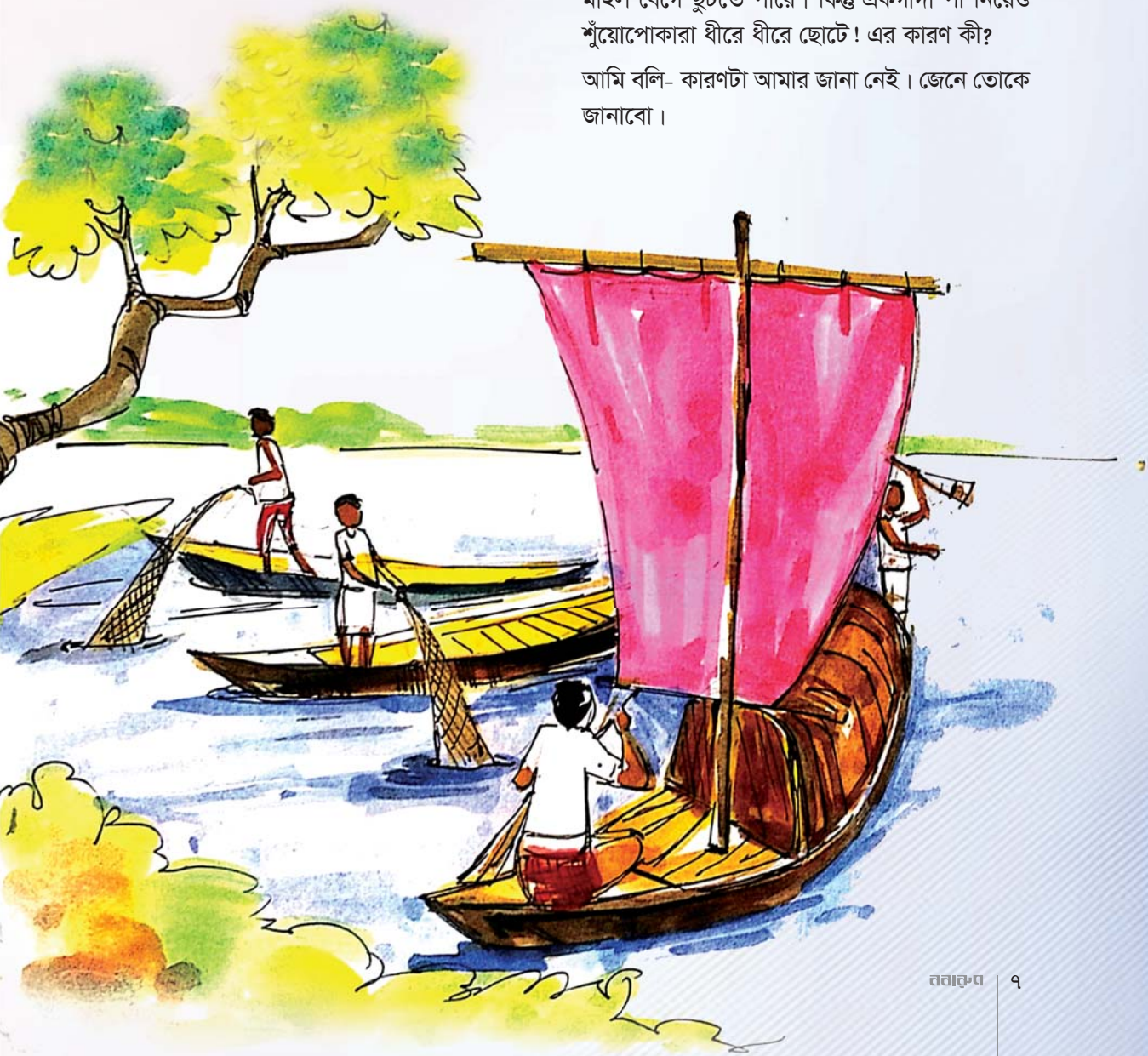

সঙ্গে সঙ্গে নদী বলে, তোমাকে আর জানাতে হবে না। আল্লাহ দ্রুতবেগে ছোটার জন্যে ঘোড়াদের সৃষ্টি করেছেন, তাই ওরা বেগে ছোটে। আর ধীরে ছোটার জন্যে শুঁয়োপোকাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই ওরা ধীরে ছোটে। এ তো সিম্পল ব্যাপারটা। অথচ তুমি তা জানো না! সে যাক, এবার একটা সহজ প্রশ্নের জবাব দাও।

: কী প্রশ্ন?

আমি শঙ্কিত চোখে নদীর দিকে তাকাই। নদী বলে, একজন টিচার শুধু একটা সাবজেক্টই পড়ান। ইতিহাসের টিচারকে বাংলা পড়াতে বললে তিনি বলেন, বাংলা আমার সাবজেক্ট নয়। আর বাংলার টিচারকে ইংরেজি পড়াতে বললে তিনি বলেন, ইংরেজি আমার সাবজেক্ট নয়। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে একজন ছাত্রকে একই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল পড়তে হবে কেন?

আবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসে নদী। সে প্রশ্নের ঝাঁপটায় আমিও অথই সমুদ্রে পড়ে যাই। কী জবাব দেবো তা ভেবে না পেয়ে মাথা চুলকাতে থাকি। তা দেখে নদী বলে, বুঝতে পেরেছি, জবাব খুঁজে পাচ্ছ না। তোমাকেও যদি আমার মতো হাজারটা সাবজেক্ট পড়তে হতো, হাজারটা বই নিয়ে স্কুলে যেতে হতো, তাহলে ঠিকই জবাব খুঁজে পেতে। আচ্ছা, আমি যাই।

আমাকে অভিযোগের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নদী চলে যায়।

দুই.

যে নদী অনবরত আমাকে বিপদে ফেলে মজা পায়, সে নদীকে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, বসে আছিস কেন? মা বকেছে?

নদী বলল, মা বলেছেন সুন্দর কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলে মন ভালো হয়। তাই ফুলের দিকে তাকিয়ে আছি, মন ভালো হচ্ছে না।

: মন খারাপ কেন?

: বই পড়ে। বইতে লেখা রয়েছে নদীর চেয়ে সমুদ্র বড়ো। লেখাটা পড়ে মন খারাপ হলো, অমনি এখানে চলে এলাম। সত্যিই কি তাই, নদীর চেয়ে সমুদ্র বড়ো?

বললাম, হ্যাঁ, সমুদ্র বড়ো। আর শুধু বড়োই নয়, এত বড়ো যে, তুই তা কল্পনাও করতে পারবি না।

: কল্পনাও করতে পারব না! তাই যদি হয়, তাহলে আমার নাম তুমি নদী রেখেছ কেন? বড়ো কিছুর নাম রাখলেই পারতে!

: বড়ো কিছুর মানে?

: বড়ো কিছুর মানে এমন কিছু, যা নদীর চেয়ে বড়ো। আমার এক বান্ধবীর নাম সাগরিকা আর ওর ভাইয়ের নাম আকাশ। নাম দুটো শুনলেই চোখের সামনে বড়ো বড়ো দুটো জিনিসের ছবি ভেসে ওঠে। আমার জন্যেও তেমন কোনো নাম রাখলেই পারতে। যেমন ধরো, ইউরেকা, গ্যালাক্সিকা বা নেবুলা জাতীয় কিছু। আর ওসব রাখতে না চাইলে মুনও রাখতে পারতে। নাহ্, তা না রেখে রেখেছ যেনতেন ধরনের একটা নাম– নদী! নামটা তো তুমিই রেখেছ, তাই না?

বললাম, হ্যাঁ, আমিই রেখেছি। কারণ আমি জানি, সমুদ্র অনেক বড়ো হলেও নদী অনেক সুন্দর। নদীর দিকে তাকালেই মনে হয় নদীর বুকে রূপালি পানির স্রোত বয়ে চলেছে। আর সমুদ্রের দিকে তাকালে মনে হয় সমুদ্রের পানি থেমে আছে। এখন তুইই বল, থেমে থাকা পানি ভালো, না বয়ে চলা পানি?

নদী বলল, বয়ে চলা পানি ভালো। এ তো সবাই জানে!

: ঠিক বলেছিস। তো এবার বলি সৌন্দর্যের কথা। নদী আর সমুদ্রের সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তাদের ঢেউয়ের মাঝে। কিন্তু ঝড় না উঠলে সমুদ্রে ঢেউ ওঠে না– নদীর বুকে সারাটাক্ষণ ঢেউ খেলে বেড়ায়। সেই ঢেউয়ের ওপর লাল-নীল পাল তুলে নৌকা চলে। মাঝিরা গান গেয়ে দূর থেকে দূরে ভেসে যায়। মানুষজন মুগ্ধচোখে নৌকার ভেসে যাওয়া দেখে।

: হায় আল্লাহ্! আমি তো শুনেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি! আর কি হয় নদীতে?

: আর জেলেরা মাছ ধরে। সমুদ্রেও ধরে, তবে এক কেজি সমুদ্রের পানিতে পঁয়ত্রিশ গ্রাম লবণ থাকে। খাওয়া যায় না। কিন্তু নদীর পানি তৃপ্তি ভরে খাওয়া যায়।

: বুঝেছি, এজন্যেই তুমি আমার নাম রেখেছ নদী। তুমি খুব ভালো দাদু।

আমার প্রশংসায় নদী উছল হলো। আমি বললাম, ভালো তো করেছি। তবে তোর নাম নদী রাখার পেছনে অন্য একটা কারণ আছে। তুই তো জানিস, কবি-সাহিত্যিকদের আমরা জ্ঞানী বলে বিশ্বাস করি। সেই কবি-সাহিত্যিকরা নদীকে নিয়ে যত লেখা লিখেছেন, সমুদ্রকে নিয়ে তত লিখেননি। এ ব্যাপারটা আমাকে প্রভাবিত করেছে। সে কারণেই তোর নাম নদী রেখেছি।

নদীকে নোংরা করা চলবে না। প্রতি মাসে একটি করে গাছ লাগাবি আর গাছের যত্ন নিবি। ভাইয়াকে বলব, ভাইয়া কোনো দিনও তুমি নদীতে কিছু ফেলবে না। অন্যকেও ফেলতে দেবে না।

: কবি-সাহিত্যিকদের কথাটা তুমি ঠিক বলেছ। রবীন্দ্রনাথ নদীকে নিয়ে একটা ছড়া লিখেছেন– আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে। কী যে সুন্দর, তুমি পড়লে মুগ্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা দাদু, নজরুল ইসলাম নদী নিয়ে কিছু লিখেননি?

: লিখেছেন। তবে সব লেখার কথা আমার মনে নেই। একটা গানের কথা মনে আছে– 'পদ্মার ঢেউ রে, মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা, যা রে।' আরো একটা গান আছে– 'নদীর নামটি অঞ্জনা, নাচে পাখি খঞ্জনা।' খুব মিষ্টি গান। জেলে-মাঝিদের সুখ-দুঃখ নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'পদ্মানদীর মাঝি' নামে এক উপন্যাস। কবি গোলাম মোস্তফা পদ্মা নদীকে নিয়ে এমন এক প্রবন্ধ লিখেছেন, যেটি পড়লে মনে হবে গদ্য নয়– তুই পদ্য পড়ছিস! কত বছর আগে পড়েছি, অথচ তার প্রতিটি শব্দ এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে– পদ্মা! পূর্ব পাকিস্তানের আদুরে সলিলকন্যা পদ্মা, আমি তোমায়...'

পরবর্তী শব্দটি ছিল 'ভালোবাসি!' কিন্তু আমি আর তা বলার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই নদী চেঁচিয়ে উঠল– থামো থামো! কবি পদ্মাকে কেন পূর্ব পাকিস্তানের আদুরে সলিলকন্যা বলেছেন, আগে সে কথাটা বলে নিই। তিনি যখন এ লেখাটা লিখেছিলেন তখন এ দেশটাকে বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান। পরে স্বাধীন হয়ে নাম হয়েছে বাংলাদেশ, তাই না?

বললাম, ঠিক তাই। তুই যে এত কিছু জানিস, এটা খুব ভালো কথা।

নদী বলল, এটা তো ভালো কথা। তবে আমার জীবনে একটা খারাপ কথাও আছে। আমার নাম নদী। অথচ আমার জীবনে এখনো নদী দেখা হয়নি! ভেবে দেখো, এটা খারাপ কথা না?

বললাম, না, একে ঠিক খারাপ বলা যায় না। তবে যে মেয়ের নাম নদী, তার নদী দেখা হয়নি– এটা দুঃখের কথা। ঠিক আছে, আমি তোকে নদী দেখাতে নিয়ে যাব।

তিন.

আমাদের বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গা। এ নদীর ওপর যে সেতু রয়েছে, আমি নদীকে নিয়ে সেই সেতুর ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম বুড়িগঙ্গাকে দেখে নদী খুশি হবে। কিন্তু কোমরে হাত রেখে সে বলল, তুমি নদী

দেখাবে বলেছিলে। এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে?

বললাম, নদী দেখাতেই নিয়ে এসেছি। আর ওই যে বয়ে যাচ্ছে, ওটা বুড়িগঙ্গা নদী।

: বুড়িগঙ্গা? যে নদীর তীরে ঢাকা অবস্থিত বলে বড়াই করা হয়, ঢাকা স্ট্যান্ডস অন দ্যা ব্যাঙ্ক অব রিভার বুড়িগঙ্গা– এটা সেই নদী? ইম্পসিবল! আমি বিশ্বাস করি না।

: কেন?

আমি বিরক্তি ভরা দৃষ্টি নিয়ে নদীর দিকে তাকালাম। নদী তার চেয়েও বেশি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, কেমন করে বিশ্বাস করব, বলো? তুমি বলেছিলে নদীর পানি রূপার মতো চকচকে– এ পানি পিচের মতো কালো! তুমি বলেছিলে নদীর পানি তৃপ্তি ভরে খাওয়া যায়– এ পানির দুর্গন্ধে আমার বমি এসে যাচ্ছে। খাবো কেমন করে? তুমি বলেছিলে নদীর বুকে তিরতির করে ঢেউ বয়ে চলে। ঢেউ কোথায় দাদু? পাল তোলা নৌকাও নেই কোথাও! যত্ত যাই বলো, তোমার কথার সঙ্গে নদীর চেহারা একেবারেই মিলছে না– নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড, দাদু! আমাকে নদীর কাছে নিয়ে চলো– ঢেউ তোলা রূপালি পানিঅলা নদী।

কোনো এক ঢেউ তোলা নদীর কাছে নিয়ে যাবার জন্য নদী বায়না ধরল। আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, অন্য কোথাও গেলেও তুই আর তেমন নদী দেখতে পাবি না। ঢেউ তোলা রূপালি পানিঅলা নদী নেই কোথাও।

: নেই কোথাও! নেই কেন? থাকবে না কেন? হয়েছে কী নদীগুলোর?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল নদী। আমি নদীগুলোর অমন হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝিয়ে বললাম। সে কথা শুনে নদী বলল, এ তুমি কী বলছ! যে মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব, যে মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহে ছুটে যাচ্ছে, নিত্যনূতন জিনিস আবিষ্কার করছে, সে মানুষ ময়লা ফেলে, নদীর পাড় দখল করে নদীগুলোর এ অবস্থা করেছে, এও তুমি বিশ্বাস করতে বলো? কিন্তু কেন মানুষ তা করবে? মানুষেরা কি নিজেদের ভালোমন্দ বোঝে না?

বললাম, বোঝে। তবে নিজেদের চেয়ে নিজের ভালোমন্দ বেশি বোঝে। সেখানেই হয়েছে সমস্যা।

: মানে? নিজেদের আর নিজের বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ, একটু সহজ করে বলো।

পাশ থেকে সরে এসে নদী মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমি বললাম, আমাদের মাঝে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। নিজেদের লাভের জন্যে তারা পুরো জাতির ক্ষতি করতেও পিছপা হয় না। দিনদিন এদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এ আমাদের দুর্ভাগ্য।

আমার কথা শুনে নদী চুপ করে রইল। কিছুটা সময় নিশ্চুপ থাকার পর সে নদীর দিকে তাকালো। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। খুউব কষ্ট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে, কষ্ট হচ্ছে কেন? খুবই কি কষ্ট হচ্ছে ?

নদী বলল, খু-উ-ব। মনে হচ্ছে নদী নয়, আমি ভয়ঙ্কর কিছু দেখছি– বিচ্ছিরি কিছু। উহ্ দাদু, কেন যে নদী দেখতে এলাম! না এলেই ভালো হতো।

নদী দু'হাতে চোখ ঢাকল। আমি ওর মাথার ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা বলছিস কেন? কত শখ ছিল তোর নদী দেখার!

নদী বলল, তা তো ছিল। কিন্তু আমার মনের ভেতর তুমি যে নদীর ছবিটা এঁকেছিলে– এখানে আসার পর সে ছবি মুছে গেছে। সেখানে ভেসে উঠেছে ফিতের মতো সরু আর কালো এক নর্দমার ছবি। আচ্ছা দাদু, তুমি যে নদীর কথা বলেছিলে, রবীন্দ্র-নজরুল নদীর যে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস লিখেছিলেন, তেমন নদী কি আমরা আর ফিরে পাবো না কোনো দিন?

বললাম, পাবো। তবে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। নদীকে ভালোবাসতে হবে। নদীর পাড় দখল করা চলবে না। আর তার চেয়েও বড়ো কথা, আবর্জনা ফেলে নদীর পানিকে নোংরা করা একেবারেই চলবে না। আমরা যদি এ কাজগুলো করে যেতে পারি, তবেই নদীগুলো আগের মতো হয়ে উঠবে। রুপালি পানি থইথই করবে। নদীর বুকে ঢেউ খেলবে।

: ঢেউ খেলবে? রূপালি পানি থইথই করবে? এত সহজ নদীকে ফিরে পাওয়া?

বললাম, হ্যাঁ, এতই সহজ। শুধু নদী কেন! স্বার্থপর মানুষ গাছ কেটে বন উজাড় করে দিচ্ছে, যেখানে-সেখানে কলকারখানা গড়ে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তুলছে। অথচ একটু সচেতন হলেই আমরা নীল আকাশ, বিশুদ্ধ বাতাস আর সবুজ বন ফিরে পেতে পারি। কিন্তু কে শুনবে এসব কথা!

নদী বলল, আমি শুনব। ভাইয়াকে শোনাবো আর বন্ধুদের শুনতে বাধ্য করব। ওদের বলব, তোরা আমার বন্ধু হলে, নদীকে নোংরা করা চলবে না। প্রতি মাসে একটি করে গাছ লাগাবি আর গাছের যত্ন নিবি। ভাইয়াকে বলব, ভাইয়া কোনো দিনও তুমি নদীতে কিছু ফেলবে না। অন্যকেও ফেলতে দেবে না। আমি তো এসব বলব, কিন্তু আমি কি পারবো নদীকে সেই রূপ ফিরিয়ে দিতে? বনকে সবুজ করে তুলতে?

আমি বললাম, পারবি। শুধু তুই কেন, আমিও থাকব তোর পাশে। তোর বাবা-মা আর প্রতিবেশীরাও থাকবেন আমাদের পাশে। আমরা সবাই মিলে আকাশ, বাতাস আর নদীগুলোকে আগের মতো করে তুলব।

আমার কথা শুনে নদীর চোখ ঝলমল করে উঠল। নদী বলল, তাই যেন হয় আল্লাহ, তাই যেন হয়। সবাই যেন আকাশ, বাতাস আর নদীকে ভালোবাসে। শুধু একটু ভালোবাসা পেলেই নদীগুলো থইথই করবে। সবুজ বন আর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। চলো দাদু চলো, কাজ শুরু করতে হবে।

আমার হাত ছেড়ে নদী সামনের দিকে পা বাড়ালো– আমাদের ছোটো নদী চোখের পলকে বড়ো হয়ে গেল! ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

গল্প

ডাস্টবিনের দুঃখ

মুহিব্বুল্লাহ কাফি

রিহান স্কুল শেষ করে যাচ্ছে বাসার দিকে। আজ পড়ার একটু চাপ ছিল। তাই টিফিন পিরিয়ডে কিছুই খায়নি ও। টাকাও ছিল হাতে। কিন্তু ও ক্যান্টিনে যায়নি। ওই সময়টা একটু পড়ে নিয়েছিল রিহান। এখন স্কুল ছুটি। দোকান থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা পটেটো চিপস কিনেছে ও। রিহান চিপস খাচ্ছে আর বাসার দিকে যাচ্ছে। রিহান খাচ্ছে, আর খাচ্ছে। একসময় শেষ হয়ে যায় তার পটেটো চিপস। এবার আনমনে চিপসের খোসাটা রাস্তার পাশে ফেলে দিল রিহান। যেই হাঁটা দেবে রিহান, এমন সময় পেছন দিক থেকে কে যেন ডেকে উঠল, অ্যাঁই ছেলে, অ্যাঁই।

আঁতকে উঠল রিহান। আচমকা এমন ডাক। ভয়ে বুকে থুথু দিয়ে রিহান পেছনে তাকালো, কেউ নেই তার আশপাশে। তবে ডাক আসলো কোত্থেকে! ধ্যাত, বলে রিহান আবার হাঁটা দিল।

অ্যাঁই ছেলে, অ্যাঁই। আবারও পেছন ডাক।

রিহান এবার ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরল। ভয়ার্ত স্বরে বলল, কে, কে?

এই যে আমি। তোমার সামনে ময়লা ফেলার যে ডাস্টবিন দেখছ, সেই আমি।

রিহান অবাক বনে গেল। ডাস্টবিন কথা বলছে। যাক, ভয় এবার কমেছে কিছুটা।

রিহান এবার সাহস নিয়ে বলল, আমাকে ডাকছ কেন?

সাধে কি আর ডেকেছি! তুমি একটু আগে যে কাজটা করেছ, সেটা কি ভালো হয়েছে?

কোন কাজ? রিহান একটু বিরক্ত হলো।

কেন, ওই যে তুমি চিপস খেয়ে খোসাটা রাস্তায় ফেলে দিলে। এটা খারাপ কাজ নয় কি?

বারে, খোসা তো ময়লা। ময়লা রাস্তায় ফেলব না তো বাসায় নিয়ে যাবো! খেঁকিয়ে উঠল রিহান।

আমি বাসায় নিয়ে যেতে বলিনি। বলল ডাস্টবিন।

তবে কী বলেছ? রাগে রিহানের চেহারা লালবর্ণ হয়ে উঠেছে এবার।

ডাস্টবিন বলল, আমি বলেছি, ময়লা-আবর্জনা রাস্তায় ফেলা ঠিক নয়।

রিহান এবার গম্ভীর স্বরে বলল, তবে ফেলব কোথায় বলো শুনি?

কেন, আমাতে। যত্রেতত্রে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে আমি ডাস্টবিনে ফেললেই তো হয়। ব্যাস, হিসেব চুকে যায়। তাছাড়া তুমি কি দেখতে পাও না আমার শরীরে কী লেখা আছে?

রিহান এবার ভালো করে পরখ করে নিল ডাস্টবিনকে। ডাস্টবিনের শরীরে লেখা 'আমাকে ব্যবহার করুন'।

এর মানে কী? রিহান একটু শান্ত হয়ে জানতে চাইল।

ডাস্টবিন বলল, এর মানে হলো, যত রকম ময়লা-আবর্জনা আছে তা যত্রতত্র না ফেলে আমি ডাস্টবিনে ফেলো। তাতে তোমাদেরই লাভ।

কী রকম লাভ? রিহান উৎকর্ণ হয়ে উঠল এবার। রাগ-ক্ষোভ সব উবে গেল। নরম হলো যেন একটু।

ডাস্টবিন বলল, যত্রেতত্রে ময়লা-আবর্জনা ফেললে সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে। সে ময়লাগুলোর উপর বৃষ্টির পানি পড়ে সেখান থেকে এডিস, মশাসহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গ জন্মাবে। যা দেখতে যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি তোমাদের জন্য অস্বাস্থ্যকর। এমনকি সেই মশা, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ তোমাদেরকেই কামড়াবে। সেখান থেকে জ্বর, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি ছড়িয়ে যাবে। পরিবেশও অপরিচ্ছন্ন দেখাবে।

রিহান ডাস্টবিনের এমন উপকারি কথা শুনে অনুতপ্ত হলো। বুঝ আসলো তার ভেতর। ডাস্টবিনকে বলল,

আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত। তুমি সত্যিই বলেছ। আমরা যত্রেতত্রে ময়লা-আবর্জনা ফেললে আমাদেরই ক্ষতি। ধন্যবাদ তোমাকে। আমাকে যত্রেতত্রে ময়লা-আবর্জনা ফেলার মতন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য।

কিন্তু তোমার ভেতর ময়লা ফেললে কি তোমার সমস্যা হয় না? চোখে কৌতূহল রেখে জানতে চাইল রিহান।

না, ময়লা-আবর্জনার কারণে আমার কোনো সমস্যা হয় না, জানালো ডাস্টবিন। কারণ, আমাকে বানানোই হয়েছে এই ময়লা-আবর্জনা বহন করার জন্য। তাছাড়া আমার ভেতর যে ময়লা-আবর্জনা জমা হয় সেগুলো পরিচ্ছন্নকর্মীরা এসে নিয়ে যায়। তাতে আমিও ভালো থাকি তোমরাও ভালো থাকবে। যদি ময়লাগুলো আমার ভেতর ফেলো যত্রেতত্রে না ফেলে।

তবে জানো কি, আমার একটা দুঃখ আছে।

ডাস্টবিন মনটা খারাপ করল। ডাস্টবিনের মন

খারাপ দেখে নিহানের চেহারাটা মলিন হয়ে উঠল। যে মানুষের ভালো থাকার জন্য এমন মহৎকর্ম করছে তার কিনা দুঃখ!

কী তোমার দুঃখ? জানতে চাইল রিহান।

ডাস্টবিন বলল, তোমরা ছোটো, তাই না জেনে না বুঝে এখানে-সেখানে ময়লা ফেলো। কিন্তু অনেক বড়ো ও শিক্ষিতরাও ডাস্টবিনে ময়লা ফেলে না। এদিক-সেদিক ময়লা-আবর্জনা ফেলে পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি বলো?

কী বললে ডাস্টবিনের দুঃখ ঘুচবে বা কী বলা উচিত কিছুই ভাবতে পারছে না রিহান। কারণ সেও তো তাদের মতোই। ও কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে বলল, কী করলে তুমি খুশি হবে?

ডাস্টবিন বলল, তোমরা সবাই যদি এদিক-সেদিক ময়লা-আবর্জনা না ফেলো। সেগুলো একত্র করে যথাস্থানে ফেলো আমি ডাস্টবিনে। তবেই আমি খুশি হবো।

ডাস্টবিনের কথা শুনে রিহান এক দৌড়ে তার খাওয়া চিপসের ওই খোসা এনে ফেলল ডাস্টবিনে। সাথে রাস্তায় পড়ে থাকা আরো দু-তিনটে কাগজ-পলিথিন কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলল। রিহানের এমন তৎপরতা দেখে ডাস্টবিন হেসে উঠল।

রিহান বলল, আমি আর কোনোদিন যেথায়-সেথায় ময়লা-আবর্জনা ফেলব না। কেউ ফেললে তাকে নিষেধ করব। কথা দিলাম তোমাকে। এবার খুশি তো তুমি?

ডাস্টবিন হেসে উঠল। ধন্যবাদ দিলো রিহানকে।

রিহান বলল, তোমাকেও ধন্যবাদ। আমাকে এমন একটা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। ❑

শিশুসাহিত্যিক

ভালো থেকো

জাফরুল আহসান

ভালো থেকো আমার গাঁয়ের গাছগাছালি
হলদে সবুজ লাল মুনিয়া পাখপাখালি;
চালতা গাছের ছায়ায় ঢাকা শাপলা পুকুর
ঘাস ফড়িঙের ডানায় বসা মিষ্টি দুপুর।

ভালো থেকো ঘুঘু ডাকা বিকেলবেলা
বকুল তলায় ঝরা ফুলের নষ্ট মেলা;
দূর্বা ঘাসের আনাজপাতি চড়াইভাতি
সাঁঝবেলাতে জোনাকজ্বলা সন্ধ্যাবাতি।

ভালো থেকো আমার গাঁয়ের মাঝিমাল্লার
নদীর ঘাটে দুষ্টু ছেলের ডুবসাঁতার;
কচি হাতে গাঁথা মালা ঝুমকো লতার
কিষাণ বধূর নাকছাবিটার রঙের বাহার।

ভালো থেকো ঝিঁঝির ডাকে স্বপ্ন বোনা
ধানের ক্ষেতে শিশির ধোয়া শস্যদানা;
বুনোফুলের গন্ধমাখা কাশের বন
সবুজ-শ্যামল নকশীকাঁথার একটি জীবন।

ভালো থাকার অনেক কিছুই রইল বাকি
ভালো থাকুক স্বপ্ন দেখার দুইটি আঁখি।

কল্পবিজ্ঞান গল্প

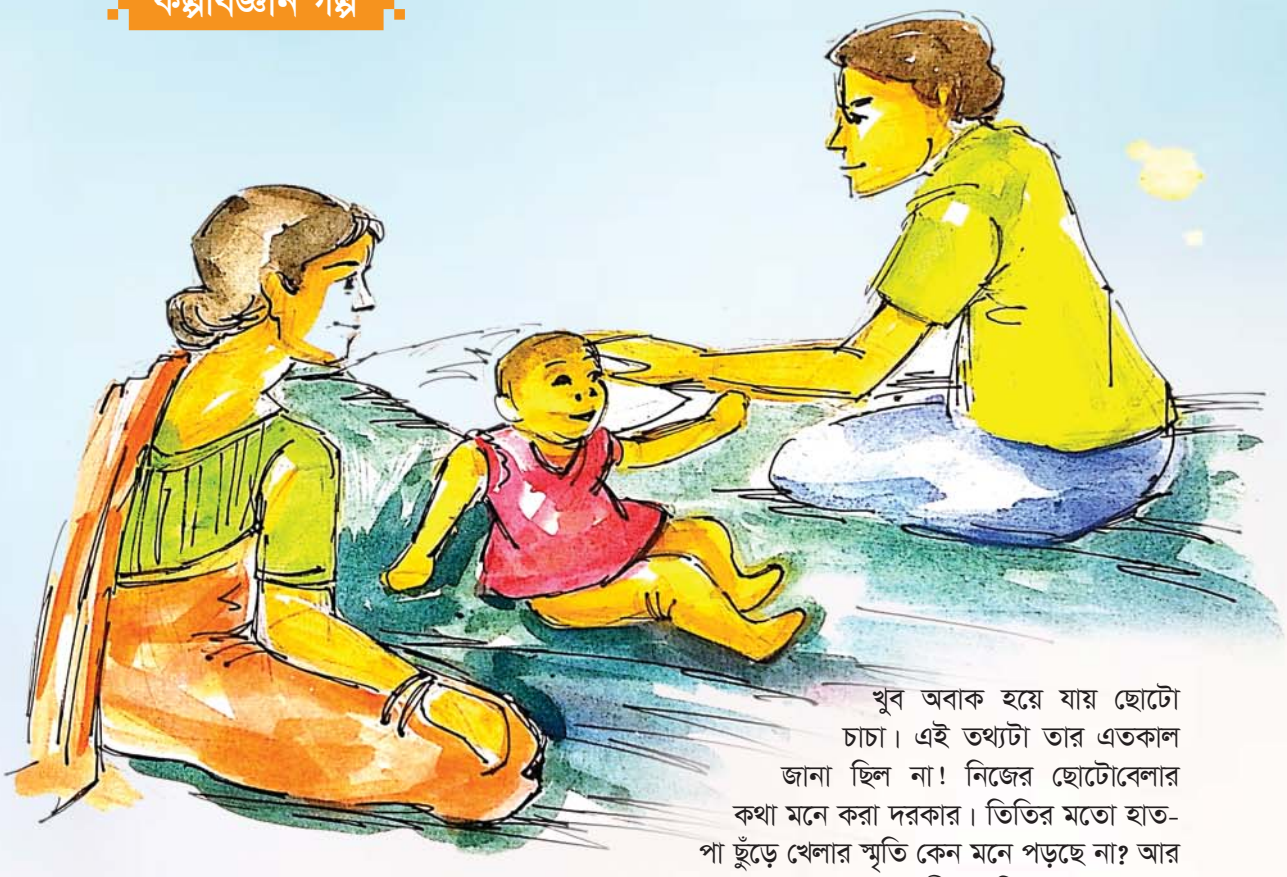

বু বু বু

নাসরীন মুস্তাফা

তিতি এখনো বসতে শেখেনি। কাত হতে হতে উলটে যায়। ঘাড় উঁচু করে হাসে। বয়স মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস। এই বয়সের পিচ্চি বাবুরা আর যা যা করে, তার সবই ওর করতে হয়।

তবে, তিতির ছোটো চাচা বলে- ও যে মুখ দিয়ে সারাক্ষণ শব্দের কুলকুচি করছে, বু বু বু। এরকম আর কেউ করে না।

মা হাসেন। বলেন, সব বাচ্চাই এভাবে কথা বলার কসরত শুরু করে। তুই-ও করতিস ইস্তি। বুড়ো হয়ে গেছিস তো, মনে করতে পারছিস না।

খুব অবাক হয়ে যায় ছোটো চাচা। এই তথ্যটা তার এতকাল জানা ছিল না! নিজের ছোটোবেলার কথা মনে করা দরকার। তিতির মতো হাত-পা ছুঁড়ে খেলার স্মৃতি কেন মনে পড়ছে না? আর ওরকম বু বু বু বলা হতো কী? ভাবি যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু ভাবি আরেকটি কথা বলেছেন, বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা। হাতের আঙুল গুনে নিশ্চিত হয়, তার বয়স আসলে তেত্রিশ বছর সাত মাস বারো দিন।

তিতির মা সকালের সব কাজ সেরে নিতে রীতিমতো ছুটছেন। ছোটো চাচা তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, আমার বয়স তেত্রিশ বছর সাত মাস বারো দিন।

তো?

এই বয়সে কি লোকে বুড়ো হয়?

হয় না? হয়।

হয়! কিছুক্ষণ ভেবে ইস্তি বলে, ভাইয়া আমার চেয়ে সাড়ে পাঁচ বছরের বড়ো। ভাইয়া তো তাহলে আরো বেশি বুড়ো!

এটা যেন কোনো ঠাট্টার কথা না। এইমাত্র একখানা

জবরদস্ত আবিষ্কার করেছে, এমন সাফল্যের আনন্দ ইস্তির চোখে-মুখে। তিতির মা হেসে ফেললেন। ওদিকে নাশতার টেবিলে বসে ছটফট করে খাচ্ছেন তিতির বাবা। অফিসে যাওয়ার তাড়া খুব। তিতিকে আদর করার তাড়াও আছে। এর মধ্যে ইস্তির কথা আর তিতির মা-র হাসি শুনে গা জ্বলে গেল। বললেন, চাকরি-বাকরি নেই। বসে বসে খাস, লজ্জা লাগে না কথা বলতে?

পুরু চশমার আড়ালে ঢাকা ইস্তির চোখ দু'টো ভিজে যায়। হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

তিতি বু বু বু করেই চলেছে। বাবা আর মা তিতিকে খুব আদর করেন। তারপর বুয়ার কোলে দিয়ে বেরিয়ে যান। বুয়া দরজা লাগিয়ে দেয়।

দোতলা বাড়ির চিলেকোঠার ঘরটিতে বসবাস ইস্তির। তিতির মা ভাবলেন, উপরে উঠে ইস্তির মনটা একটু ভালো করে যাবেন। হাতের ঘড়িতে সময় দেখে এই চিন্তা বাদ দিতেই হলো।

এরপরের দুই দিন ইস্তির দেখা পাওয়া গেল না। তিতির বাবা খুব রেগে আছেন ইস্তির উপর। ওকে ডেকে এনে সেধে খাওয়ানোর কোনো চেষ্টা তিতির মা করতেই পারলেন না। রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ইস্তি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। কিন্তু চাকরি-বাকরির কোনো চেষ্টাই করল না। ছোট্ট ঘরটায় অসংখ্য যন্ত্রপাতির জাল বিছিয়ে দিনরাত কেবল খুটুরমুটুর করে। কী করছে জানতে চাইলে এত্ত কথা বলে! ওর কথাগুলো বিজ্ঞানের এ মাথা থেকে ও মাথা ধরে ছুটতে থাকে। তিতির বাবা আর মায়ের মতো বিজ্ঞান না জানা লোকেরা তখন হিমশিম খায়।

সাড়ে তিন দিনের দিন ঘর থেকে নিচে নেমে এল ইস্তি। দুই কানে সাঁটা হেডফোনের গোল গোল দুই বোতাম সাইজের রিসিভার। পকেটে আটকানো ক্লিপের মতো কিছু একটা। ইস্তির চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, দারুণ কিছু ঘটে গেছে। সে তো ঘটেছেই! রেডিওতে বিবিসি-র ইংরেজি খবরটা আজ সকালে এই অনুবাদক যন্ত্রের কারণে ইস্তির কানে ঢুকেছে বাংলা হয়ে। পৃথিবীর যে কেউ যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, ইস্তি তা শুনবে বাংলা ভাষায়।

এই কয়দিনের খিদে এখন খামচি মারছে ইস্তির পেটে। অগত্যা তিতিদের বাসায় আসতেই হলো। বুয়া ইস্তিকে দেখে মুখটা তেঁতো বানিয়ে বলল, সব কাজ শেষ, চুলা নিভিয়ে ফেলেছে।

একটা ডিম পোঁচ অন্তত করে দাও।

খুব দয়া দেখিয়ে ডিম পোঁচটা করা হলো। দ্রুত খেয়ে বিদায় হতে হবে। কেননা, এখন বুয়ার গড়ানোর সময়।

গড়ানো মানে?

ঘুমাইতাম।

সকাল সাড়ে দশটা বাজে মাত্র। এখন তুমি ঘুমাবে?

হ, ঘুমাইতাম। আফত্তি আছে? তাইলে কন, অহনি অন্য বাড়িত্ কাম লমু। আল্লায় দিলে এই বান্দার কামের অভাব নাই। গজগজ করতে থাকে বুয়া। সারাদিন গাধার খাটনি খাটে, একটু আরাম করবে, তারও উপায় নেই। সব কাজ শেষ। তিতির মা যা যা বলে গেছে, সব করেছে। তিতির জন্য দুধ, সুজি সব ওর মা নিজের হাতে তৈরি করে রেখে যায়। বুয়া নাকি টাইমমতো এক বোতল দুধ একটু আগে তিতিকে খাইয়ে দিয়েছে।

তিতির নাম শুনে ইস্তি থমকে যায়। ডিম পোঁচসহ প্লেটটা হাতে নিয়েই তিতির ঘরে ঢোকে। ছোট্ট সুন্দর বাবুটা বু বু বু করছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে। ইস্তির কী যে ভালো লাগে তিতিকে দেখতে! ডিম পোঁচ একবারে মুখে পুরে ইস্তি তিতির বু বু বু শোনে।

খাবো। খেতে দাও। খেতে দাও। মা কই। মা আসো। খেতে দাও। চাচা পচা। একা খায়। আমি খাবো। দুধ খাবো। দুধ খাবো। মা মা মা।

তিতি কাঁদছে। বুয়া খুব দরদ দেখিয়ে ছুটে আসে। তিতিকে কোলে নিয়ে ধমকায় ইস্তিকে। আফনেরে দেখলে ডর আহে। নাওয়া-খাওয়া নাই, ভূত কোনহানকার। না না তিতি, কাইন্দ না বাবু।

তিতি আবার বু বু বু করে। ইস্তি শোনে, বুয়া পচা। খেতে দেয় না।

ইস্তি বুঝতে পারে তিতিকে। তিতি যে বু বু বু করে, এ-ও যে এক ভাষা! সব শিশুদের এরকম কুলকুচি তাহলে ওদের কথা! মায়ের গর্ভে বেড়ে ওঠার সময়

এই কথা ও শেখে। নাকি নিজেই তৈরি করে নেয় নিজের ভাষা?

এতসব পরে ভাবা যাবে। আগে তো তিতিকে খাওয়াতে হবে।

বুয়া, তিতির পেটে খিদে।

কইছে আফনেরে!

ও খাবে।

এট্টু আগে এক ফিডার দুধ খিলাইছি।

বু বু বু। তিতি বলছে, বুয়া খায়। দুধ খায়।

ইস্তি কোমরে দুই হাত রেখে বুয়াকে প্রশ্ন করে, ফিডারের দুধ কি গ্লাসে ঢেলেছিলে?

হ ঢালছি। তড়বড় করে এটুকু বলে থমকে যায় বুয়া। তারপর বলে, দুধ গেলাসে ঢালুম কিল্লাই? তিতি কি গেলাসে খাইতে ফারে? ফাগলের মতো কী কন্?

দুধ তিতি খায়নি। তুমি খেয়েছ।

বুয়া আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কান্না শুরু করে। এরকম বেইজ্জতি কথাবার্তা তাকে কোনো বাসাতেই কেউ বলেনি। আজ আসুক তিতির মা, ও জবাব দিয়ে দেবে। দরকার নেই এই বাসায় কাজ করার।

ইস্তি আগে কখনো দুধ বানায়নি। তবু মাথা খাটিয়ে এক বোতল দুধ বানায়। তিতির মুখের কাছে নিতেই ও শোনে, বু বু বু। চাচা ভালো। দুধ খাবো। মজা। মজা।

তিতি চট্ করে খেয়ে নিল দুধ। ওর পেটে কত যে খিদে ছিল! ওদিকে বুয়া কিন্তু বলেই চলছে, কী না কী খাওয়াইল। তিতির মা আইলে বুঝাইবনে মজা।

ইস্তিকে বলতে গেলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল বুয়া। তার গড়ানোর সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। না গড়ালে সে কাজ করতে পারবে না। ইস্তির কিন্তু তিতির সাথে থাকতে খুব ইচ্ছে করছিল। ওর বু বু বু ভাষা শিখতেই হবে।

ইস্তি নিজের ঘরে কিছুক্ষণ টিভির সামনে বসে রিমোট টিপতে থাকল। শাহরুখ খান যা যা বলছে, তা ইস্তির কানে ঢুকছে বাংলা হয়ে। এই প্রথম ইস্তি বুঝল, শাহরুখ খান আসলেই ভালো অভিনয় করে। বারাক ওবামা ভাষণ দিচ্ছেন, বাংলা ভাষায়। ইরানের প্রেসিডেন্ট আর চীনা প্রেসিডেন্ট বাংলায় বাতচিত করছেন। সবই ভালো, কিন্তু তিতির বু বু বু যত মিষ্টি, তত আর নয়।

বুয়ার গড়ানো শেষ হলো বোধহয়। ইস্তি নেমে আসে নিচে। দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো। কেন? দরজায় কেন তালা দেওয়া? কয়েকবার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দেয় ইস্তি, বুয়া বুয়া বলে ডাকে। সাড়া না পেয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেখে বুয়া, দারোয়ান আর এক মহিলা ফকিরের সাথে কথা বলছে। ফকিরটার কোলে একটা ছোটো বাচ্চা, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। তিতি বুয়ার কোলে। ইস্তিকে দেখে বুয়া চমকে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ভিক্ষা দিবাম।

ও!

কী ভালো বুয়া! ফকিরকে ভিক্ষা দেয়। তিতি আপনমনে কলকল করে ওঠে। ইস্তি শোনে, পচা পচা পচা।

কে পচা? কী পচা?

ইস্তি তিতির কাছে জানতে চায়, কে পচা? কী পচা?

বুয়া ধমকে ওঠে, ফ্যাচ ফ্যাচ করতাছেন ক্যান্? আফনেরে আল্লা কুনো কাম দেয় নাই?

ইস্তি মাথা চুলকায়। কাজ তো আছেই। তিতির কথা বুঝতে পারার পর ওর মাথায় ভূত চেপেছে। এই যন্ত্র কতখানি কাজের তা বুঝতে হবে। পশুপাখির ভাষা বোঝা যায় কি না, দেখতে হবে। গলির মাথায় একটা কুকুর রাতের বেলায় কান্নার মতো শব্দ করে। ওর কীসের দুঃখ, জানতে হবে। ইস্তি কুকুরটাকে খুঁজতে গিয়ে ভুলে যায় তিতির কথা। গেট খুলে বেরিয়ে যায়। পেছনে তিতি তখনো কাঁদো কাঁদো স্বরে বু বু বু করে বলছে, পচা পচা পচা।

গলির মোড়ে কুকুরটা নেই। দিনের বেলায় কোথায় গেছে কে জানে? ওদেরও কি তিতির বাবা-মা'র মতো অফিস-টফিস করতে হয়? কুকুরটার কথা শুনতে পেলে জানা যাবে অনেক কিছু।

রিকশায় করে এক মা যাচ্ছিলেন, কোলে তার ছোট্ট বাবু। বাবুটা কেন যেন কোলে থাকতে চাচ্ছে না। ইস্তি শুনল, বাবুটা বলছে, গাড়ি ঘরঘর। গাড়ি ঘরঘর।

বাবুটা কি রিকশাওয়ালাকে রিকশা চালাতে দেখে মজা পেয়েছে? সে নিজেই চালাতে চায়? তাই বুঝি নেমে যেতে চাইছে মায়ের কোল থেকে?

তিতিকে নিয়ে রিকশায় চড়তে হবে। দেখতে হবে, তিতি তখন কী করে। তিতির কথা মনে পড়ায় ইস্তি হনহন করে হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে। গলিটা পেরুতেই দেখে, মহিলা ফকিরটার সাথে সাথে বুয়াও রাস্তা পার হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। বুয়ার কোলে তিতি। ঘটনাটা কী? কোথায় যাচ্ছে বুয়া?

ইস্তি পেছন পেছন যেতে থাকে। বুয়ার নাকি এখন গড়ানোর সময়! না গড়িয়ে সে যাচ্ছে কোথায়?

কিছুক্ষণ পরই বোঝা গেল, বুয়া যাচ্ছে কোথায়। মোটামুটি ভিড়ওয়ালা এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ওরা। বুয়া মহিলা ফকিরটার মতো করেই হাত পাতে মানুষের সামনে। ইস্তি ভিড়ের ভেতরে এগিয়ে ওদের কাছে গিয়ে শুনল বুয়ার কথা। মানুষ দেখলেই বুয়া বলছে, সাহায্য করেন। আমার বাচ্চাটা আইজ এক্কেরে না খাওয়া।

কে একজন জানতে চাইল, বাচ্চা কী তোমার?

জে, আল্লায় দিছে।

কী সুন্দর বাচ্চাটা!

বুয়া দুঃখ দুঃখ গলায় জবাব দেয়, গরিবের ঘরে চান্দের আলো। তয় খাওয়াইতে পারি না।

গরমে নেতিয়ে পড়েছে তিতি। অল্প অল্প বু বু বু করছে। ইস্তি শুনল, মা গো! গরম। পচা। পানি। পানি। তিতি মনে হয় ঘুমিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। ইস্তির মাথা ঘুরতে থাকে কাণ্ড দেখে। এই বুয়া তো ভয়ংকর! কী করা যায়? ভাইয়া-ভাবিকে এক্ষুণি জানানো দরকার। ইস্তির মোবাইল ফোন নেই, ভাইয়া-ভাবির ফোন নম্বরটাও জানা নেই। কেন ও এভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে, এ নিয়ে বকা খেয়েছে অনেক। আগে গা করত না। এখন মনে মনে নিজেই নিজেকে বকতে শুরু করল।

ভাবির অফিস বেশি দূরে না। হেঁটেই চলে যেতে পারে ও। কিন্তু ততক্ষণে বুয়া যদি তিতিকে বিক্রি-টিক্রি করে দেয়! ও কি নিজেই মুখোমুখি হবে? বুয়ার কোল থেকে ছিনিয়ে নেবে তিতিকে? বুয়াটা যা পাজি! ও যদি উলটো ছেলেধরা বলে চিৎকার দেয়! তাহলে গণপিটুনি খেতে হবে ইস্তিকেই।

ইস্তির মাথা কাজ করছিল না। ও কতক্ষণ ওরকম ভিড়ের ভেতর লুকিয়েছিল, নিজেও বলতে পারবে না। এক সময় বুয়া ভিক্ষে করা টাকাপয়সা শাড়ির

আঁচলে বেঁধে হাঁটতে শুরু করে। ইস্তিও পিছু নিল। বুয়া ওদের বাড়ির সামনে গেলে ইস্তি থেমে যায়। যাক্, তিতি তবে বাড়ি ফিরছে।

দারোয়ান গেট খুলে দিলে বুয়া বলে, সুলাইমান ভাই, সর্বনাশ!

তিতির ঘুম ভেঙে যায় দারোয়ানের গলা শুনে। ও বুঝতে পারে, বাড়ি ফেরা হয়েছে। খিদে আর পানির পিপাসা আবার অস্থির করে তুললে ও কান্না শুরু করে। গলায় কোনো জোর নেই। তবু কান্না তো কান্না। দারোয়ান সর্বনাশের কথা ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না দেখে ধমক দেয় তিতিকে। এক্কেরে পাখির ছাও। খালি ট্যাঁ ট্যাঁ করে!

বুয়া তিতির কান্না থামানোর জন্য ঝাঁকাতে থাকে। বলে, দেইখ্যা ফালাইছে।

ক্যাডা?

পাগলাডা।

অহন?

আর দেরি করা যাইত না। যা করার আইজ রাত্তিরেই।

হ। বুঝছি।

তয়?

জাইগা থাকিস্। তিন টোকা। মনে থাকব?

থাকব না মাইনে? তিন টোকা। তিন।

বুয়া তিন তিন তিন বলতে বলতে দরজার তালা খোলে। তিতি নরম গলায় বু বু বু করছে। এর অর্থ হচ্ছে, তিন তিন তিন।

তিতির মা আগে বাড়ি ফেরেন। তিনি দেখলেন, তিতি ঘুমাচ্ছে। ওর পেট দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভালোমতো খেয়েছে। গলায় পাউডার দিয়ে দেওয়া। মাথায় গোটা দশেক চুল, তাও সুন্দর করে আঁচড়ানো। গায়ের জামাটা পাখার বাতাসে উড়ছে। কপালে কালো টিপ, কেউ যেন নজর দিতে না পারে সেই জন্য। কী সুন্দর লাগছে তার লক্ষ্মী সোনা বাবুটাকে!

মা খুব খুশি হলেন বুয়ার উপর। বললেন, তুমি না বেনারসি শাড়ি চেয়েছিলে? এবারের ঈদে তোমাকে কিনে দেবো।

সত্য!

বুয়ার ভাব দেখে মনে হলো, উড়ে যাবে! ঈদের পর বিয়ে নাকি হবে। বিয়েতে বেনারসি পরবে। আহা, কী আনন্দ!

তিতির মা আজ ঈদের বোনাস পেয়েছেন। তিতির বাবারও আজ বোনাস পাওয়ার কথা। কাল শুক্রবার। দু'জনে মিলে ঈদের সব কেনাকাটা সেরে ফেলবেন। তিতি সোনার জন্য যে কত কিছু কিনবেন!

মনটা ভালো, তিতিও ঘুমাচ্ছে। বাবা বাড়ি ফেরার পর মা তাই ইস্তির জন্য নাশতা-টাশতা বানালেন। তারপর দু'জনে মিলে ওর ঘরে গেলেন ঝগড়া করার জন্য। কোনো খোঁজখবর নেই, এ কী রকম কথা!

ইস্তি খাবে কী আর তিতির বাবা-মা ওকে কি-ই বা খাওয়াবেন? সারাদিনের বৃত্তান্ত শুনে তিতির বাবা আর মা আকাশ থেকে পড়লেন। এত ভালো বুয়া, কত যত্ন করে তিতিকে। ইস্তি কেন যে এসব আবোল- তাবোল বলছে!

ইস্তি নিজেও খুব ক্লান্ত। কথা আর না বাড়িয়ে ওর 'বাংলা মেশিন'-এর রিসিভার ভাইয়ার দুই কানে ঠেলে দিয়ে ক্লিপটা লাগিয়ে দিল পকেটে। এতে নাকি তিতির কথা বুঝতে পারা যাবে!

বুঝতেই পারছ, ইস্তির দারুণ কাজের ভাষা অনুবাদক যন্ত্রটার নামই 'বাংলা মেশিন'।

রাত বারোটা বেজে তেত্রিশ মিনিট সাত সেকেন্ড হলো। শব্দ হলো টুক টুক টুক। কথামতো তিন বার। বুয়া অন্ধকারেই চলতে পারে ঘরের যে-কোনো দিক। বছর খানেক আছে না এই বাড়িতে! সব যে ওর চেনা। দরজা খুলে দিতে একটুও সময় লাগল না। দরজা খুলতে শব্দও হলো না এক ফোটা।

এরকম নিঃশব্দে দরজা খোলার টেকনিক বুয়ার ভালোই জানা আছে। এর আগের বাসাগুলোতেও তো এরকম খুলেছে। ওর দলের লোকেরা ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতর। বাড়ির লোকেরা বিছানায় ঘুমায়, ওরা তাদের নাকের উপর ক্লোরোফর্ম মেশানো রুমাল ধরে আরো ভালো করে ঘুম পাড়ায়। বুয়া তো জানেই আলমারির চাবি কোথায় থাকে। খুব অল্প সময়ে টাকাপয়সা-গয়না সরিয়ে ফেলে ওরা। সব শেষ হলে বুয়া নিজের ভাগটা যুতসই জায়গায় সরিয়ে রেখে নিজের নাকের উপর রুমাল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। ডাকাতের দল বাড়ির সবাইকে অজ্ঞান করে ডাকাতি করেছে, এমনই বোঝা যায়। বুয়াকে কেউ সন্দেহ করতে চাইলেও পারে না। এবারও নিশ্চয়ই তাই হবে।

খুব চমকে গিয়ে বুয়া দেখল, দরজার ওপাশে অনেক আলো। চোখে ধাঁধা লাগার আগে কেন যেন মনে হলো সুলাইমান ভাই আর তার ফকির বোনটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। কেন যেন মনে হলো আরো কেউ কেউ আছে ওদের সাথে, তাদেরকে কেন যেন পুলিশ পুলিশ মনে হলো।

তিতি তখন ঘুমাচ্ছিল। অত রাতে জেগে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব না। সারাদিন রোদে থেকে খুব কাহিল ও। জেগে ছিল তিতির বাবা, মা আর ছোটো চাচা। তবে বুয়া বুঝতে পারেনি।

সন্ধ্যায় ঘুম থেকে জেগে তিতি ঠিকই বু বু বু করেছে। তিতির বাবা আর মা খুব মনোযোগ দিয়ে বু বু বু শুনছিল। ওরা সবাই বুঝতে পারল, কী ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আজ রাত্রে! দরজায় তিন টোকা পড়বে। তিন তিন তিন। বুয়া দরজা খুলে দেবে। তখন ওর দলের অন্যরা ঘরে ঢুকবে। নাকের উপর ক্লোরোফর্ম মেশানো রুমাল ধরে তিতির মা-বাবা-ইস্তিকে ঘুম পাড়াবে। এরপর বুয়া আলমারির চাবি বের করে দেবে। টাকাপয়সা- সোনাদানা সব সরিয়ে ফেলবে। এরপর বুয়া নিজের নাকের উপর রুমাল ধরে ঘুমিয়ে পড়বে। দিনের বেলায় সবাই যখন জেগে উঠে কাঁদবে, বুয়াও কাঁদবে। পুলিশ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারবে না।

যা করার আজ রাত্তিরেই করবে ওরা।

বুয়ার হাসি পাচ্ছিল কাণ্ড দেখে। মনে মনে গজগজ করেছে, বুঝন যায় না, ফুঝন যায় না, তাও শুননের কত শখ! ঢং আর কারে কয়?

আহা, তিতি-র বু বু বু বুয়া যদি তখন বুঝতে পারত! ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

বাঘারামের পিঠে মিউমিউ

পঙ্কজ শীল

এক বন ছিল বিশাল এবং সুন্দর। সেই বনের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছিল এক শান্ত নদী। নদীর দুই ধারে বিশাল সব গাছপালা, ফুলের গন্ধে ভরা বাতাস, সেখানে হেসে- খেলে বেড়াচ্ছিল নানা প্রজাতির পশুপাখি। এই বনেই বাস করত মিউমিউ নামের একটি ছোট্ট বিড়াল। সে ছিল খুবই খুদে, কিন্তু তার দুঃসাহসিকতা ছিল অসাধারণ।

মিউমিউ প্রতিদিন নতুন এক অ্যাডভেঞ্চারের জন্য প্রস্তুত থাকত। তার ছিল বড়ো স্বপ্ন বনের সবচেয়ে বিশাল প্রাণী বাঘের পিঠে চড়ে একবার পুরো বন ঘুরে আসা। সে জানত, বাঘের পিঠে ওঠা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মতোই ভয়ংকর হতে পারে। তবুও মিউমিউ কোনোকিছুকে ভয় পায়নি।

একদিন সকালে সূর্য উঠছিল আর মিউমিউ তখনই নির্ধারণ করে ফেলল, আজই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে। সে প্রথমেই চলে গেল ক্ষ্যাপাটে বাঘের কাছে, তার নাম ছিল বাঘারাম। বাঘারাম ছিল বনটির সবচেয়ে শক্তিশালী পশু, তবে সে ছিল একটু অলস।

'হ্যালো বাঘারাম!' মিউমিউ বলল, 'আমি তোমার পিঠে চড়ে বনের চারিদিকে একটু ঘুরতে চাই! আমাকে তোমার পিঠে নিয়ে ঘুরবে?'

'হাহাহা! তুমি কি সত্যিই সেটা করতে চাও?' বাঘারাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি তো অনেক ছোটো, আমি মনে করি আমার খেলার সঙ্গী হিসেবেও তুমি আমার কোনো কাজে আসবে না।'

'তবে আমি তো চেষ্টা করেই দেখতে পারি, তাই না?' মিউমিউ বলল সচ্ছল ভঙ্গিতে।

বাঘারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর সে বলল, 'ঠিক আছে, তবে আমাকে তুমি যে-কোনোভাবে ইঙ্গিত দিও। আমি তোমার জন্য ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।'

বাঘারাম মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং মিউমিউ সাহস নিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল। একটু ভয় লাগলেও মিউমিউ নিজের সাহসকে জোরালো করে রাখল।

'আরো জোরে চলো!' মিউমিউ বলল।

এদিকে বাঘারাম হেসে ফেলল। সে জানত, মিউমিউ এর মতো ছোট্ট বিড়ালকে নিয়ে গতি বাড়ানো সহজ নয়, কিন্তু সে চেষ্টা করতে চাইল। তারপর বাঘারাম বনের ভেতরে চলা শুরু করল।

বনটির সৌন্দর্য চমৎকার! মিউমিউ যখন বাঘারামের পিঠে বসে চারপাশে তাকালো, তখন সে দেখল সবুজ গাছ, নানা রঙের ফুল এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি উড়ে যেতে।

'আহ, এটা সত্যিই অসাধারণ!' মিউমিউ আনন্দে জোরে চিৎকার করে বলল।

এমন সময় হঠাৎ তাদের বিপদে পড়তে হলো। সামনে দেখা হলো এক হিংস্র বন্য শুকরের সাথে। শুকরটি বাঘারামের দিকে দ্রুত ছুটে আসছিল।

‘বাঁচাও!’ মিউমিউ ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলল।

‘চিন্তা করো না মিউমিউ, আমি এটা দেখব,’ বাঘারাম আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল। সে শুকরটিকে দৌড়ে আক্রমণ করল। শুকরটি অবাক হয়ে পেছনে সরে গেল, কিছুক্ষণ পরেই পাতাসহ গাছে লুকালো।

‘ দেখলে!’ বাঘারাম হেসে বলল। ‘মনে রেখো, তুমি কোনো ভয় পাবে না, আমি সবসময় তোমাকে রক্ষা করব।’

মিউমিউ আবার পিঠে বসে পড়ল, এবার তারা আবার নিজেদের পথে বেরিয়ে পড়ল। বনের মাঝে চলে যেতে যেতে তারা আরো অনেক সৌন্দর্য দেখল। এক জোড়া হংস, একটি হালকা স্রোত বয়ে চলেছে যেখানে তারা জল পান করার জন্য এসেছিল।

‘এটা তোমার জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা!’ বাঘারাম বলল।

কিছুক্ষণ পর তারা সেই নদীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে অনেক পশুপাখির ভিড় ছিল। সবুজ পানি, ধীরে ধীরে বইছে। মিউমিউ নদীর পাড়ে বসে স্রোতের দিকে তাকালো।

‘আমি নদীতে সাঁতার কাটব!’ মিউমিউ একেবারে খুশিতে বলল।

‘তুমি নদীতে যাবার আগে বুঝে নাও, সেটা নিরাপদ না,’ বাঘারাম সতর্ক করে বলল।

‘কিন্তু আমি খুব সাহসী,’ মিউমিউ বলল। সে নদীর পাড়ে চলে গেল এবং সাঁতার কাটার জন্য প্রস্তুত হলো।

মিউমিউ সাঁতার কাটতে শুরু করল। সে খুবই আনন্দে ছিল। হঠাৎই সে অনুভব করল, সে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে।

‘সাহায্য করো’ মিউমিউ চিৎকার করে বলল।

বাঘারাম তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপ দিল। সে মিউমিউকে ধরতে সক্ষম হলো তারপর মিউমিউকে নিয়ে বাঘারাম পাড়ে উঠল।

‘তুমি ঠিক আছো?’ বাঘারাম মিউমিউকে জিজ্ঞেস করল।

মিউমিউ বলল, ‘হ্যাঁ,ঠিক আছি কিন্তু আমি শান্ত হতে পারলাম না,’

এ সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো এক বৃদ্ধ কচ্ছপ। তার নাম ছিল নিকি। নিকি খুবই জ্ঞানী, সে জানতে চাইল, ‘তুমি ওর জন্য কী করছ?’

বাঘারাম বলল, ‘আমি তাকে রক্ষা করছি।’

নিকি বলল, ‘দেখ, ছোট্ট বিড়ালটির সাহস দেখে ভালো লেগেছে, কিন্তু কখনও কখনও সাহসী হতে চাইলে সতর্কভাবে চলতে হয়।’

মিউমিউ তার কথা মন দিয়ে শুনে মনে মনে সঠিক শিক্ষা নিলো।

সেই দিনটা শেষে তারা অনেক কিছু শিখল। ‘আজকের দিনটি সত্যিই অসাধারণ ছিল,’ মিউমিউ বলল।

‘হ্যাঁ, তবে মনে রাখতে হবে বিপদকে!’ বাঘারাম বলল।

মিউমিউ একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো। তাদের নতুন বন্ধুত্বটা অনেক শক্তিশালী হয়েছিল।

সেই থেকে মিউমিউ এবং বাঘারাম বনের বেশ কিছু অ্যাডভেঞ্চার উন্মোচন করে। তারা বন্ধুত্ব, সাহস এবং সতর্কতা নিয়ে আরো অনেক কিছু শিখল। এভাবে তাদের গল্প চলতে থাকে, আর প্রতিনিয়ত তারা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করল। বাঘের পিঠে মিউমিউয়ের এ জার্নি মনে করিয়ে দেয়, সত্যিকার সাহস শুধু নাড়া দেয় না, বরং গতির হলেও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে সাথে চলতে হয়।

হাসি আর ভালোবাসায় ভরপুর সেই বন এখনো উজ্জ্বল, বনবাসী পশুপাখিরাও তখন থেকে নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে সেই মজার এ দুটো বন্ধুত্বের কারণে, যারা এক সাথে নানা ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করে একে অন্যকে সাহস যোগায়। ❑

কবি ও শিশুসাহিত্যিক

বাবা দিবসের কথা

মো. ইকবাল হোসেন

'বাবা' একটি ছোট্ট শব্দ। কিন্তু এর ব্যাপকতা বিশাল। বাবা মানে আস্থা, নির্ভরতা, শক্ত খুঁটির ভর। বাবা হচ্ছে সন্তানের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জায়গা। বাবাকে স্মরণ করা মাত্রই হৃদয় শীতল হয়ে যায়। সন্তানের কাছে বাবা হলেন বটবৃক্ষের ছায়ার মতো। বাবা যেন এক নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র। বাবা মানে একজন আদর্শ সৈনিক। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ প্রতিনিধি। বাবার কাছে তার সন্তান হলো সমতল ভূমির মতো। যিনি নিজের জীবন বাজি রেখে শুধু উৎসর্গ করেন সন্তানের জন্য। কোনো কিছুতেই পিছপা হন না।

বাবা কেবল মাত্র একটি ছোট্ট শব্দই নয়। অদম্য উচ্ছ্বাস, অনুপ্রেরণা ও অনিবর্তিত শক্তি। যে শক্তি রূপান্তরিত হয়ে সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে অপরিসীম ভূমিকা পালন করছেন। বাবারা তাদের আদর, স্নেহ, ভালোবাসা প্রত্যেক সন্তানের কাছে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি বাবা একজন সফলতার বীজ বপনকারী। যিনি সন্তানকে ছোটোবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখিয়ে চলছেন। হোঁচট খেলে বুকে আগলে অনুপ্রেরণা উৎসাহিত করছেন। জীবনের প্রতিটি ধাপে তিনি সন্তানের পাশে থাকেন। নিজের ইচ্ছে ত্যাগ করে সন্তানের ইচ্ছে পূরণ করেন। বাবারা সন্তানদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে উজ্জীবিত করেন। সন্তান যখন জীবন সংগ্রামে থমকে যায়, পেছন থেকে বাবা এসে হাল ধরেন। বাবার চোখ দিয়ে সন্তানেরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা খুঁজে। এই পৃথি বীর প্রত্যেকটি বাবাই যেন এক একজন সুপার হিরো।

মা-বাবার কাছে সন্তানের যে ঋণ, তা কখনও পূরণ হয় না। তবু ভালোবাসার প্রতিদানে বাবাদের জন্য রয়েছে এক বিশেষ দিন, বিশ্ব বাবা দিবস। জুন মাসের তৃতীয় রোববার হলো বিশ্ব বাবা দিবস। এটি ১৯০৮ সালের ৫ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ফেয়ারমন্টে প্রথম পালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন প্রতিবছর বাবা দিবস পালনের রীতি চালু করেন। সেই থেকে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই বাবা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভরে যায় বাবাদের সাথে সুন্দর সব মুহূর্তের ছবি আর গল্পে। অনেকেই কেক কাটেন, কিংবা সবাই মিলে খেতে যান রেস্টুরেন্টে। অনেকেই বাবা দিবসে বাবাকে দিয়ে থাকেন বিশেষ উপহার।

বাবা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার দুঃখকষ্ট প্রকাশ না করে সন্তানদের বেড়ে ওঠার প্রতিটি দিন, প্রতিটি অধ্যায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মায়ের পর যদি কেউ আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের হন তিনি হলেন আমাদের বাবা। যতক্ষণ বাবার হাত আমাদের মাথায় থাকে ততক্ষণ আমাদের কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করার দরকার হয় না। তিনি নিজের দুঃখ নিজের কাছে রাখেন এবং আমাদের শুধু সুখটা বিলিয়ে দেন।

আমাদের কখনোই আমাদের বাবার সংগ্রাম ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের সর্বদা বাবার ত্যাগ উদ্‌যাপন করা উচিত এবং তাদের সম্মান করা উচিত। তার মুখে হাসি ফোটাতে বাবা দিবসে একটু বিশেষ চেষ্টা করা যেতেই পারে। এটাই হোক বিশ্ব বাবা দিবসে বাবাদের প্রতি সবার প্রত্যাশা।

সেরা বাবা

মো. আবরার হাসান

বাবা তুমি সবার সেরা
বলতে চাই বারবার,
তোমার ছায়ায় ধন্য জীবন
চাই না অন্য কিছু আর।

আমায় খুশি করতে তুমি
করো কত কষ্ট
তোমার দোয়ায় আগলে রেখো
হই না যেন পথভ্রষ্ট।

এদিক তাকাই, ওদিক তাকাই
সব দিকেই শুধু তুমি
আমার হৃদয় ক্যানভাসে
আঁকা তোমার ছবি।

[নবম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

গল্প

গরু নিয়ে গণ্ডগোল

জুয়েল আশরাফ

গ্রামের নাম বটনগর। এই গ্রামেরই কয়েকজন কিশোর মাহিন, রাইয়ান, সাদাফ আর আয়ান। বিকেলে তারা মাঠে বসে গল্প করছে। সামনে কোরবানির ঈদ। সবাই খুব উত্তেজিত- কার বাড়িতে কেমন গরু আসবে, এসব নিয়েই আলোচনা। কিন্তু একটা সমস্যায় পড়েছে এদের ছোট্ট মহল্লা। গ্রামের এই প্রান্তে কারো বাড়িতেই এখনো গরু আসেনি। অথচ পাশের পাড়ায় রীতিমতো গরুর হাট বসে গেছে। আলম চাচার গরু এসেছে সিলেট থেকে, পাঁচ লাখ টাকার গরু! রাইয়ানের চোখ গোল হয়ে যায়।

মাহিন বলল, সবাই যদি গরু না কিনে, তাহলে কুরবানির আনন্দটা কোথায়?

সাদাফ বলল, আমাদেরও তো একটা কিছু করতে হবে! নইলে সবাই ভাববে আমরা গরু আনতে পারি না!

আয়ান বলল, আচ্ছা, ধরো, আমরা নিজেরাই একটা গরু কিনি। গ্রাম থেকে সবাই মিলে ভাগাভাগি করে একটা গরু আনতে পারি। যাদের মাংস কিনার সামর্থ্য নেই তাদের মধ্যে মাংস বিলি করব।

রাইয়ান বলল, ভালো আইডিয়া। কিন্তু টাকাটা কে দিবে?

মাহিন গম্ভীর মুখে বলল, আমার কাছে জমানো সাত হাজার টাকা আছে।

সবাই হেসে ফেলে, কিন্তু তারপর আবার সিরিয়াস হয়ে যায়। মাহিন বলে, মামা এসে বলছিল, পীরগঞ্জ হাটে আজ গরুর দাম অনেক কম। যদি মিলেমিশে কিছু টাকা জোগাড় করা যায়, একটা ছোটো গরু কেনা যেতেই পারে।

রাইয়ান বলে, তাহলে তোদের সঙ্গে আমিও চার হাজার টাকা দিচ্ছি।

সাদাফ বলে, আমি আমার সাইকেল বিক্রি করব, কমপক্ষে দশ হাজার পাবো!

সবাই দারুণ উদ্যমে উঠে পড়ে। কিন্তু নতুন প্রশ্ন- গরু রাখবে কোথায়?

মাহিন বলে, আমাদের ঘরের পেছনে একটা খালি জায়গা আছে। খড় বিছিয়ে দিলে দিব্যি গরু থাকবে।

তখনই সবাই ভাগ হয়ে যায়, কেউ টাকা সংগ্রহ করতে, কেউ খড় জোগাড় করতে, কেউ খুঁটির ব্যবস্থা করতে।

খোরশেদ চাচার কাছে যায় তারা। চাচা বললেন, তোমরা যদি একসঙ্গে একটা গরু আনো, আমি এক বস্তা খড় ফ্রি দেবো!

এইভাবে একদিনের মধ্যেই তাদের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যায়। পরদিন সকালে চারজন মিলে রওনা হয় পীরগঞ্জ হাটে। হাটে গিয়ে দেখে, বড়ো গরু একেবারেই তাদের বাজেটের বাইরে। কিন্তু ছোটো সাইজের, কালো-সাদা ছোপ ছোপ গরুটা যেন ঠিক তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। গরুর মালিক বলল, ষাট হাজারে দিয়ে দেবো ভাই, গ্রাম্য ছেলেপুলে তো তোমরা, কম করে দিলাম।

সবাই মিলে দরদাম করে সেটা তিপ্পান্ন হাজারে নামিয়ে আনে। বাকি টাকাটা রোহান ভাই দিয়েছেন। শর্ত একটাই, কোরবানির দিনে কোনো অসহায় মানুষ যেন মাংস থেকে বঞ্চিত না থাকে!

তিন ঘণ্টা পর তারা মাঠে গরু নিয়ে হাজির। পুরো গ্রামের সবাই দেখছে গরুটাকে। কেউ বলছে, এ যে একেবারে দেশি গরু! কেউ বলছে, এই গরু দেখে তো আমার নিজের গরুর দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছে!

সেই দিন থেকে প্রতিদিন দুপুরে চারজনে মিলে গরুকে গোসল করায়, খাওয়ায়, খুঁটি বাঁধে, গান গায়।

গরুর নাম রাখা হয়েছে বাদশা। রাইয়ানই নামটা দিয়েছে। বলেছে এটা আমাদের ঈদের বাদশা। নাম বাদশা রাখলে কেউ আর খুঁত ধরবে না।

গরুটা বেশ সুন্দর। টকটকে বাদামি গা, মাথায় সাদা রঙের ছোপ, আর চোখে কেমন শান্ত এক ধরনের ভাব। কিন্তু ওর লেজের হুইসা একবার লাগলে মশা-মাছি তো দূর হবেই, মানুষও সরে যায়।

গরুটা মাঠের একপাশে রাখা। খুঁটি গাথা হয়েছে শক্ত করে। আশপাশে ঘাসের ঝাড়, একটা টিনের ছাউনি দিয়েছে ছেলেরা, আর দড়ি দিয়ে ঘিরে দিয়েছে চতুর্দিকে। চারপাশে রঙিন কাগজ টাঙানো, যেন মেলায় এসেছে গরুটা।

মাহিন দায়িত্ব নিয়েছে গরুর খাবার সংগ্রহের। সে প্রতিদিন সকালে বাজার থেকে ভুসি, খৈল আর কলা এনে দেয়। আয়ান নিয়মিত পানি দেয়। আর সাদাফ গরুর গা চেঁছে দেয় নারকেলের ছোবড়া দিয়ে। গরুটাও যেন খুশি থাকে।

তবে গরু পাহারার দায়িত্ব রাইয়ানের উপর। সে বলেছে, এটা এখন আমাদের গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার। কারো গরু না থাকুক, আমাদের গরুর বাদশা আছে। কেউ যদি রাতে এসে দড়ি কেটে নিয়ে যায়, তাহলে তো আমরাই হেয় হয়ে যাব।

রাইয়ান দুই রাত ধরে মাঠে ঘুমিয়েছে। একটা মশারি নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে, আর পায়ের কাছে লাঠি। রাতে মাঝে মাঝে গরুটা উঠে দাঁড়ায়, ঘাস খায়, আবার বসে পড়ে। এক রাতে তুহিন এসে বলল, রাইয়ান ভাই, আমি আজকে আপনার সঙ্গে থাকি। একা একা ভয় লাগে না?

রাইয়ান বলল, বাদশা থাকলে ভয় কীসের? এই গরুটা যদি একবার দৌড়ায়, পুরো গ্রাম হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে।

সেই রাতে হঠাৎ করে গরুটা অদ্ভুতভাবে হুঁ হুঁ করে ডেকে উঠল। তুহিন চমকে উঠে বলল, কী হইছে ভাই! ও হামলা করে নাকি!

রাইয়ান লাঠি হাতে এগিয়ে গেল। দেখল, এক দল কুকুর ঢুকেছে মাঠে। গরুটা তাদের দেখে রাগে লাফাচ্ছে।

রাইয়ান বলল, তুই দাঁড়া, আমি বাত্তি আনতেছি।

টর্চ হাতে ঘুরে কুকুর তাড়িয়ে দিল তারা। পরদিন

সকালবেলা সবাই এসে দেখে গরুটা একদম চকচকে, লোমে লোমে চিটচিটে আলো পড়ছে। হাবিব বলল, ওই যে, গরুটা তো একদম মেলা-মাঠের মতো হয়ে গেছে!

সাদাফ বলল, এইবার শুধু কোরবানি বাকি।

ঈদের আগের দিন সকালে রোহান ভাই আসলেন ঢাকা থেকে। এসেই দেখলেন মাঠে এক বিশাল আয়োজন। তিনি বললেন, তোমরা এই বয়সে এমন উদ্যোগ নিয়ে গরু কিনেছ, একসঙ্গে দেখাশোনা করছ এটাই আসল ঈদের চেতনা। এটা কেবল কোরবানির ঈদ না, এটা উৎসর্গের, ত্যাগের, ও ভালোবাসার ঈদ।

রোহান ভাই কথা বলতে বলতে গরুর পিঠে হাত বুলালেন। গরুটা ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো তার দিকে। যেন বুঝে গেল, এ লোক ভালো।

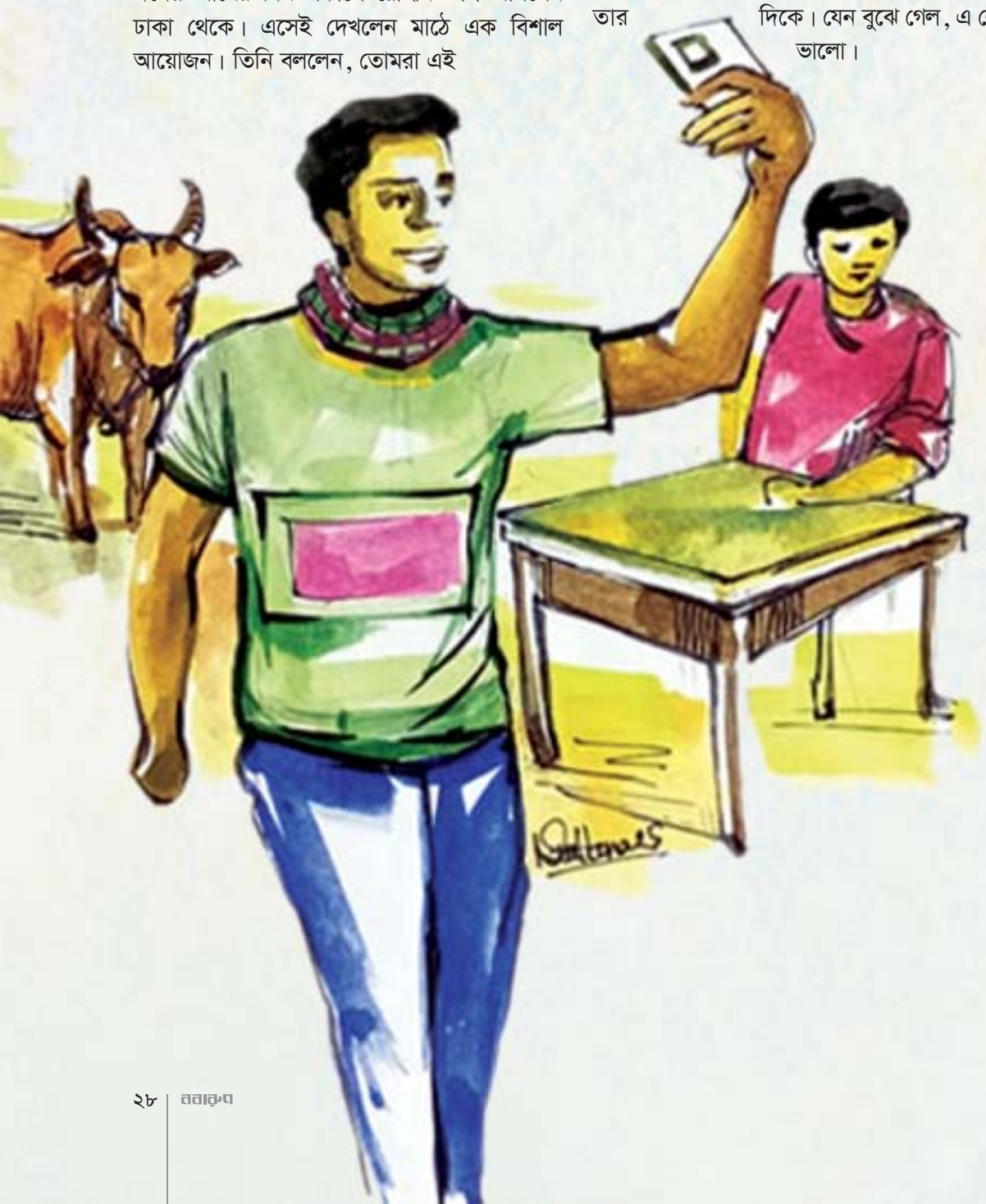

মাহিন বলল, ভাই, আমরা তো এখন শুধু একটা জিনিস নিয়ে চিন্তিত।

রোহান ভাই বললেন, কী সেটা?

আয়ান বলল, গরু কে কোরবানি করবে?

সবাই চুপ। এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর প্রশ্ন। রোহান ভাই হাসলেন। বললেন, ঢাকা থেকে এক কসাই নিয়ে এসেছি। ঠিক কাল সকাল দশটায় সে চলে আসবে।

সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচল। ঈদের আগের দিন বিকেলে মাঠজুড়ে এক উৎসব। ছোটোরা গরুর চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে, বড়োরা এসে প্রশংসা করছে, আর রাইয়ান গর্বে গরুর সামনে দাঁড়িয়ে গলায় গামছা ঝুলিয়ে ছবি তুলছে। তবে মাহিন চুপচাপ গরুর পাশে বসে আছে।

সাদাফ বলল, কী রে? চুপ করে আছিস কেন?

মাহিন আস্তে বলল, বাদশাকে মনে হয় মিস করব...

তখন আয়ান বলল, কিন্তু মনে রেখো, বাদশা শুধু একটা গরু না, সে আমাদের গ্রামের ঈদের ইতিহাস হয়ে থাকবে।

রাত নেমে এল। বাতাসে ঈদের গন্ধ। সকালে কোরবানির দিন।

পরের দিন। সকালের আজান দিয়ে ভোরের আলো ফোটে। মাঠের দিকে সবার চোখ। বাদশা আজ কিছুটা চুপচাপ। হয়ত ও টের পেয়ে গেছে, আজকে সেই দিন। রাইয়ান ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে যায় বাদশার কাছে। গরুর গলায় হাত বুলিয়ে বলে, বাদশা, তোরে আজকে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু তুই যা করে গেছিস, আমরা কোনোদিন ভুলব না।

মাহিন কলস ভর্তি পানি এনে গরুর গা ধোয়াতে থাকে। সাদাফ গোসলের পর নারকেলের ছোবড়া দিয়ে চুলকায়, যেন ওর শেষ সাজসজ্জা ঠিকঠাক হয়। কসাই ঠিক দশটায় আসে। তার পেছনে অনেক মানুষ। মাঠে যেন এক ঈদের মেলা।

রোহান ভাই এসে গরুর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এই গরুটা শুধু মাংস না, এই গরু একটা গল্প। এই গল্প তোমরা সবাই লিখেছ। ত্যাগ মানেই শুধু পশু কোরবানি না, ত্যাগ মানে সময় দেওয়া, একসঙ্গে থাকা, দায়িত্ব নেওয়া। তোমরা সেটা করেছ।

কসাই গরুর পাশে দাঁড়ায়। চারপাশে নীরবতা। তুহিন হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে, 'আমার বাদশা' বলে সে।

রাইয়ান এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখে, চুপ, ভাই। বাদশা চাইত, আমরা যেন না কাঁদি, গর্ব করি।

মাহিন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চোখে জল। বাদশা হঠাৎ একবার ডাকে- একটা গভীর, ভারী হুঁ হুঁ।

সবাই দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে। গরু চলে যায়, কিন্তু মাঠটা এখনো ভরে আছে তার গন্ধে, তার চিহ্নে।

রাইয়ান বলে, এই জায়গাটায় একটা কিছু রেখে দিতে হবে। একটা স্মৃতি।

তারা গরুর গলার ঘণ্টা আর একটা খুঁটির টুকরো মাটির নিচে পুঁতে রাখে। উপর দিয়ে ছোট্ট একটা কাঠের ফলকে লিখে- এখানে বিশ্রাম নেয় বাদশা, আমাদের প্রথম কোরবানির গল্প।

গ্রামের সবাই আসে মাঠে। ছোটোরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ফলকের সামনে।

তখন রোহান ভাই বলে, আজ থেকে এই মাঠের নাম 'বাদশার মাঠ'। প্রতি বছর ঈদের আগে এখানে আবার দেখা হবে।

সন্ধ্যাবেলা ছেলেরা খেজুর, মুড়ি আর কোল্ড ড্রিংকস নিয়ে বসে মাঠে। হাসাহাসি করে, গল্প বলে, কেউ বলে, পরের বছর দুইটা গরু কিনব!

রাইয়ান বলে, হ্যাঁ, আর একটা নাম রাখব-বাদশা।

সবাই হেসে উঠে। তুহিন বলে, তখন আমি পাহারা দিবো!

আকাশে ঈদের চাঁদ উঁকি দেয়। গরু কোরবানিতে তারা শিখে নেয় দায়িত্ব, বন্ধুত্ব, আর ভালোবাসা কীভাবে ভাগ করে নেওয়া যায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

গম ও ধানের কথা

শাহীন পরদেশী

একতা পাড়া। কৃষকের ঘরে ঘরে ফসল। সবাই কমবেশি ফসল ফলায়। এই গ্রামের দুরন্ত ছেলে শাকিল। ওর বাবা একজন পাক্কা কৃষক। বাবা এবার গম ও ধান একসাথে রেখেছেন। মানে এক ডোলে গম। আর একটি ডোলে ধান।

মজার বিষয় হলো, গম ধানকে দেখতে পারে। ধান গমকেও দেখতে পারে। খুব ভালোভাবেই দেখতে পারে। খুব কাছাকাছি ডোল দুটি। শাকিল খুবই মিশুক। সবার সাথে থাকতে চায়। একা থাকতে মোটেও পছন্দ করে না। সে বাবাকে বলল, ডোল দুটিকে আরও কাছে রাখতে হবে। বাবা বললেন কেন? ওর কথা ওদেরও একসাথে থাকা প্রয়োজন। একঘেয়েমি যেন না লাগে। শাকিল নাছোড়বান্দা। ডোল দুটি আরও কাছাকাছি রাখা হলো।

হঠাৎ একদিন গম বলল, ধান ভাইয়া কেমন আছো তুমি?

হ্যাঁ, ভালো আছি।
তুমি কেমন আছো?
গম বলল, আমিও ভালো আছি।
তবে ইদানীং খুব কষ্ট হচ্ছে। একটা বিষয়ে।
কীসের কষ্ট তোমার। বলো তো শুনি?
গম বলল, তোমাকে দেখে খুব কষ্ট হয়।
আমাকে দেখে তোমার কষ্ট হয়। মজা নাও তুমি।

আরে না, না, মজা নেবো কেন। ওমা তুমি তো দেখছি কিছুই জানো না। সত্যি, সত্যি, সত্যি বলছি। তোমাকে নিয়ে সবার একটু বেশি কষ্ট হয়।

কই না তো।

হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে একটু বেশি কষ্ট হয়। আর দেখো আমাকে নিয়ে তোমার মতো কষ্ট করতে হয় না। আমার জন্য কৃষকদের কদর বেশি।

এবার ধান গেল খ্যাপে। তোমার চেয়ে আমার কদর বেশি। তুমি জেনেও এমন করে বলছ কেন?

গম বলল, ধুত্তোরি, কী বলো তুমি। আমার কদর বেশি। আমাকে খাওয়ার জন্য সবাই ভালোবাসে। তাদের প্রিয় খাবার আমি।

ধান আরও রেগে বলল, যত ফসল আছে তার মধ্য আমার কদর বেশি। আমাকে সবাই নিয়মিত খায়। আমার যত্ন সেজন্য বেশি বেশি করে বুঝলে।

গমও রেগে লাল হয়ে গেছে। ইশ! কী আজেবাজে বলো তুমি। আমাকে তাদের বিশেষ খাবার হিসেবে রাখে। আমাকে খাওয়ার জন্য গোশতের ঝোল খোঁজে। আমাকে সবাই মজা করে খায়।

ধান মুচকি হেসে বলল, তোমার বুদ্ধি কম গম ভাইয়া। এতক্ষণে যা বুঝলাম।

কী বুঝলে বলো তো শুনি?

তাহলে শোনো গম ভাইয়া, তোমার থেকে ময়দা হয়। মানুষ হঠাৎ করে একদিন বা দু-দিন খায়। নিয়মিত কী খায় তোমাকে।

গম বলল, না। সেজন্যই তো আমার কদর বেশি। আমাকে তাদের স্পেশাল খাবার হিসেবে রাখে।

আসলেই তুমি বোকা গম ভাইয়া। আমার থেকে চাল হয়। তারপর ভাত। আর ভাত সবাই নিয়মিত খায়। একদিন ভাত না খেলে তাদের হয় না। সেজন্যই আমার জন্য কৃষকেরা বেশি কষ্ট করে। যাতে ফলন বেশি পায়। কৃষক আমার রূপচর্চা না করলে সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে। বুঝলে গম ভাইয়া।

ধানের কথা শুনে গমের মুখ শুকিয়ে গেছে। কী বলবে, কী বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ বুদ্ধি করে বলল, তুমি দেখতেই বিশ্রী। নোংরা কোথাকার। আর আমায় দেখো আমি কী পরিষ্কার। চকচক করছে আমার গা।

বোকারাম গমরাম। আসলেই তোমার বিবেকবুদ্ধি নেই। সৌন্দর্যের বড়াই করো না। আয়নায় গিয়ে দেখো আগে নিজেকে। মানুষেরাই বলে কে বেশি সুন্দর। শুনতেই তো পারো, আমি বেশি সুন্দর দেখে আমাকে সবাই সোনালি ধান নামে ডাকে।

একের পর এক গম ও ধানের ঝগড়া চলছে মানে চলছেই। কেউ একটু নরম হয় না। তবে গম শুধু হেরেই যাচ্ছে।

অবশেষে ধান গমকে বলল, দেখো গম ভাইয়া, আমাদের এসব নিয়ে ঝগড়া করা মোটেও ঠিক নয়। ঠিক একদিন আমরা আর এখানে থাকব না। আমাদের যেতে হবে মানুষ, পশুপাখি কারো না কারো পেটে। একদিন তো যেতেই হবে। তাই এসব নিয়ে ঝগড়া করে আমাদের কী কোনো ফায়দা হবে?

গম বুঝতে পেরে বলল, ঠিক বলেছ ধান ভাইয়া। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। একদিন তো চলেই যেতে হবে। আমাদের এসব নিয়ে বড়াই করা নিছক পাগলামি।

তারপর থেকে গম ও ধান আর ঝগড়া করে না। ওরা হয়ে গেল একে অপরের ভালো বন্ধু। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

‘ব’ তে বাবা

মো. মোকাদ্দেস আলী

বাবাকে ছাড়া বিভার পাঁচটি দিন ভালো কাটে না। আম্মু আর দাদি প্রতিটা দিন বলে, বিভা এটা করো না। বিভা ওটা করো না। বিভা খামোশ। বিভা সাবধান। আর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হলেই সব ডান। কারণ বৃহস্পতিবার বাবা বাড়িতে আসে। বিভার প্রতি খবরদারি তখন সবার কমে যায়।

বিভার পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় যদি কেউ থাকে সে হলো বাবা। বাবা শব্দটি বিভাকে অনেক আনন্দ দেয়। বাবাকে পাশে পাওয়া মানে আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া। বাবার কাছে কোনো না নেই। তাই বৃহস্পতিবার এলেই বিভা অর্জন করে সুপ্রিম পাওয়ার।

বিভার প্রিয় বর্ণ ব। কারণ ব দিয়ে লেখা যায় বাবার নাম। বাহাউদ্দিন। প্রিয় শব্দটাও লেখা যায় ব দিয়ে। বাবা। আর নিজের নাম তো লেখা যায়-ই। বিভার পুরো পৃথিবী জুড়ে যেন খালি বাবা আর বাবা। বাবা মাঝে মাঝে অন্যরকম সব আনন্দদায়ক কাণ্ড ঘটায়।

এই তো সেদিনের ঘটনা বাবা এসে বলল, চলো মা মণি তোমাকে নিয়ে চাঁদের দেশে ঘুরে আসি। চাঁদের বুড়ির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। বিভা রাজি হয়ে বলল, চলো। এরপর ছাদে উঠে বাবা মেয়ে অনেকক্ষণ পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকল। আর নানান গল্প করল। জোছনার আলোয় যেন চাঁদের দেশে ঘোরা হয়ে গেল। এরপর ছাদ থেকে নামতে নামতে বাবা বলল, চাঁদের বুড়ি তো আমাকে একটা কথা বলেছে। তোমাকে কী কিছু বলেছে মা মণি?

বিভা বলে, হুম বলেছে তো।

- কী বলেছে?

- চাঁদের বুড়ি বলেছে, তোমরা হঠাৎ করে আসলে তাই আপ্যায়ন করতে পারলাম না। খুব শীঘ্রই আমি তোমাকে দাওয়াত দিব। আসবে কিন্তু।

- ও মা! তাই নাকি? আমাকেও তো একই কথা বলেছে।

এই বলেই বাবা মেয়ের সে কি হাসি!

এই রকম আজগুবি গল্প বাবা মেয়ে দুজনেই করে। বিভা একটু বেশি করে। বিভার আজগুবি গল্পগুলো বাবা ছাড়া আর কেউ গুরত্ব দিয়ে শুনে না।

আবার পড়াশুনার কথা বলি। আম্মু আর দাদি সারাদিন পড়াশুনা নিয়ে রাগ করে। বাবা একদমই বকা দেয় না। একদিন মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষার নম্বরপত্র দেখে আম্মু খুব বকা দিল। অভিভাবকের স্বাক্ষরের কলামে স্বাক্ষর করলই না। বরং রাগ হয়ে বলল, যাও তোমার বাবার কাছে গিয়ে নম্বরপত্রে স্বাক্ষর নাও। বাবার কাছে যেতেই বাবা নম্বরপত্র নিয়ে ঘষঘষ করে স্বাক্ষর দিয়ে দিলো। এরপর খুবই নরম স্বরে বাবা বলল, মা মণি, স্যারেরা মনে হয় তোমায় ভুল করে বাংলায় কম নম্বর দিয়েছে।

অমনি বিভা বলে উঠল, বাবা, আমি তো সব লিখেছি শুধু একটা লিখতে পারিনি। কিন্তু হয়েছে কী, আমার অনেক বানান ভুল হয়েছে। যে কারণে কম নম্বর এসেছে।

- কোনো ব্যাপার না। আগামীবার আর বানান ভুল হবে না। আরও ভালো হবে। তাই না!

- হুম, ভালো তো করতেই হবে।

- পড়াশুনায় মনোযোগী হতে হবে। ফার্স্ট, সেকেন্ড আর থার্ড হওয়ার দরকার নেই। তুমি শুধু পড়ার সময় পড়াটা পড়ো। যতটুকু পড়বে মনোযোগ দিয়ে পড়বে। মন যা চায় তাই করবে। কেমন!

আজ শুক্রবার। সকালের ঘটনা। বিভা বাবার কাছে এসে বলল, বাবা আমি তোমার জন্য একটা গিফট তৈরি করেছি।

- গিফট! কী গিফট?

জানতে চায় বাবা। অমনি বিভা দৌড়ে ছুটে যায় নিজের ঘরে। হাতে করে নিয়ে আসে সাদা রঙের শোলা। বিভা ওটা ওলটাতেই দেখতে পেল একটা ব। বাংলা বর্ণমালার ব। বাবার হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমার জন্য।

বাবা দেখল শোলা কেটে তৈরি করা ব টা নানান রঙে সজ্জিত করেছে। পুরো ব-এর উপরে নানান ডিজাইনের ফুল এঁকে সেখানে গ্লু দিয়ে লাগিয়েছে। দেখতে অসাধারণ সুন্দর হয়েছে।

বিভা বলল, বলো তো বাবা, এই ব তে কী হয়?

বাবা বলল, ব তে বাংলাদেশ।

- ব তে বাংলাদেশ হয় ঠিকই। কিন্তু এই ব তে না। এই ব তে হয় বাহাউদ্দিন। এই ব তে হয় বাবা। আমার প্রিয় বাবা।

মেয়ের এরকম ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হয় বাবা। বাবা-মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে দুলতে থাকে। দুজনেই যেন খুশির দেশে বেড়াতে বেড়িয়েছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

টিফিন বক্সে ভূতের চিপস

শায়লা শারমিন মীরা

রিদান ছিল একটা চঞ্চল ছেলে। যে-কোনো জিনিস খুলে দেখা, ঘাঁটাঘাঁটি করা, অদ্ভুত প্রশ্ন করা ছিল তার প্রিয় শখ। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সে রাস্তায় এক পুরনো দোকান দেখতে পেল। দোকানটার নাম ছিল 'সাড়ে তিন টাকার বাজার'। দোকানদার ছিল এক বুড়ো, যার চুল কাঁচাপাকা আর চোখে গোল চশমা। রিদান ভেতরে ঢুকেই চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল। একটা মোজা বিক্রি হচ্ছে ছাতা হিসেবে, সাবান বিক্রি হচ্ছে খেলনা বল হিসেবে!

বুড়ো হেসে বলল, 'এই নাও, বিশেষ চিপস! খুবই স্পেশাল, কিন্তু একা খাবে না, সাবধানে খাবে।'

রিদান তো মহাখুশি! এমন অদ্ভুত দোকান থেকে এমন মজার কিছু পেল! বাসায় ফিরে সে চুপিচুপি চিপসের প্যাকেটটা ব্যাগে রেখে দিল।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে টিফিন পিরিয়ডে সে ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বের করে খুলল। আর তখনই 'ভুঁউঁউঁ' করে।

প্যাকেট থেকে ধোঁয়ার মতো একটা কুণ্ডলি বেরিয়ে এসে আকার নিতে নিতে হয়ে গেল এক হাস্যোজ্জ্বল ভূত! মাথায় চিপসের মতো বাঁকানো টুপি, চোখে সানগ্লাস আর গলায় শিকলের মালা!

রিদান ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ত... তুমি কে?'

ভূত বলল, 'আমি চিপস-ভূত! একসময় ছিলাম 'ফাস্টফুডের রাজা'। কিন্তু এক জাদুকর আমাকে প্যাকেটে বন্দি করে দিয়েছিল। যদি কেউ আমাকে খাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে খোলে, তবে আমি বেরিয়ে আসতে পারি!'

রিদান বলল, 'তাহলে তুমি কি কাউকে খেয়ে ফেলো?'

ভূত হেসে বলল, 'না রে ভাই! আমি খেলতে ভালোবাসি! তুমি যদি আমার সঙ্গে তিনটা খেলায় জিততে পারো, তাহলে তোমার জন্য থাকবে এক জাদুকরি উপহার।'

রিদান সাহস করে বলল, 'চলো দেখি কী আছে তোমার খেলায়!'

[খেলা ১: চোখ বুজে খাবার চিনতে হবে]

ভূত তার চিপস-জাদু দিয়ে কয়েকটা খাবার বানিয়ে রিদানকে দিল। চোখ বেঁধে বলল, 'চিনে বলো, এটা কী?'

রিদান প্রথম কামড়েই বলল, 'এইটা তো সিদ্ধ ডিমের সঙ্গে দাদির বানানো শুকনা মরিচ ভর্তা!'

ভূত চমকে উঠল। দ্বিতীয়বার দিল কুড়মুড়ে একটা খাবার রিদান বলল, 'এইটা তো আম্মুর বানানো আলুর চপ!'

ভূত হাঁ করে বলল, 'তুমি তো একেবারে ফুড এক্সপার্ট!'

[খেলা ২: ভূতের ছায়া ধরো]

ভূত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই যদি আমার ছায়া ধরতে পারিস, তবে জিতবি!' রিদান কিছুক্ষণ দেখে বুঝল ভূত আসলে জানালায় ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে, ছায়াটা একটা আয়নার দিকে পড়েছে। সে আয়নার সামনে গিয়ে ছায়া ধরতেই ভূত চেঁচিয়ে উঠল, 'এইটা তো প্রতারণা!'

রিদান বলল, 'না ভাই, এইটা তো বিজ্ঞান!'

[খেলা ৩: হাসি চেপে রাখো]

এবার ভূত শুরু করল চোখ দিয়ে নাক বানানো, কান দিয়ে হুইসেল বাজানো, এমনকি হেডফোনে মুরগির ডাক শুনিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে আমার নতুন গান 'বক বক ড্যান্স'!'

রিদান প্রথমে ঠোঁট চেপে ধরল, তারপর একটু টেনে ধরল, শেষমেষ নিজের চুল কামড়ে ধরল! ভূত এত হাস্যকর ভঙ্গি করল যে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ল!

[জাদুকরি উপহার]

ভূত বলল, 'তুই জিতেছিস! এই নে, আমার ম্যাজিক পেন। এটা দিয়ে যা লিখবি, সেটা এক মিনিটের জন্য সত্যি হয়ে যাবে।'

রিদান ভাবল 'সত্যি? তাহলে আমি কি পরীক্ষার খাতায় লিখে '১০০ পেয়েছি' বললেই হবে?' ভূত বলল, 'না না, খারাপ কিছুতে এটা কাজ করবে না। শুধু ভালো কাজের জন্য।'

রিদান সেই পেন দিয়ে শুরু করল

'মাকে এক মিনিটের বিশ্রাম'

'বন্ধুর জন্য এক মিনিটের বরফ-চকলেট'

'স্কুলের সামনে এক মিনিটের বাগান'

সব কিছু এক মিনিটের জন্য হলেও সবাই খুশি। সবাই রিদানকে পছন্দ করতে লাগল।

গুজব ছড়িয়ে গেল স্কুলে-

'রিদানের টিফিন বক্সে একটা কিছু আছে। কেউ কখনও চিপস চাইলে সাবধানে চাইবে!'

কেউ বলত, 'ওর টিফিন বক্স নাকি জাদুর বাক্স!'

আবার কেউ বলত, 'ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে রিদানের মতো সাহসী হওয়া যায়!'

কিন্তু রিদান হাসত। সে কাউকে কিছু বলত না। কারণ সে জানত ভালো কাজই সবচেয়ে বড়ো জাদু। আর যে কেউ চাইলে সেই জাদু নিজের ভেতরেই তৈরি করতে পারে।

একদিন ভূত আবার দেখা দিল। বলল, 'আমি যাচ্ছি এখন অন্য এক চিপসের প্যাকেটে। কিন্তু মনে রেখো, ভালো কাজ করাই আসল বীরত্ব।'

রিদান বলল, 'তুমি কোথায় যাবে?'

ভূত চোখ টিপে বলল, 'কোনো এক বাচ্চার ব্যাগে, যেটা একটু এলোমেলো, কিন্তু হৃদয়টা একদম গুছানো!'

বলেই সে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল। ❑

শিক্ষার্থী, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গাছ লাগাবো

মো. সজিব হোসেন

পরিবেশের ভারসাম্য
বজায় থাকে গাছে
গাছ থেকে পাওয়া অক্সিজেনে
আমাদের জীবন বাঁচে।

গাছের ফুলে সুবাস ছড়ায়
মন উজাড় করা ঘ্রাণে
এ গাছের ফল খেয়ে
সবার শক্তি আসে প্রাণে।

খালি জায়গায় গাছ লাগাবো
মিলে মিশে সবাই
সবুজে ঘেরা দেশ গড়তে
গাছের বিকল্প নাই।

[দশম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]

সুন্দর পরিবেশ

মো. মাসুদুর রহমান

সুস্থ জীবন চাই যে সবাই
বুক ভরে নিবো বিশুদ্ধ বাতাস
বেশি বেশি গাছ লাগাবো
সবুজ শ্যামলে করব বসবাস।

কলকারখানার দূষিত বায়ু
ছড়ায় না যেন বিষ
দূষণ রোধে সচেতন করব
গড়ব সুন্দর একটি পরিবেশ।

মারব না কেউ বনের পশু
খালি জায়গায় করব চাষ
ফুল ফসলে প্রিয় ভূমি
ভরে উঠবে বারো মাস।

ক্ষতিকারক দ্রব্যগুলো
করব মোরা বর্জন
বাঁচবে প্রাণী বৃক্ষ রাজি
নদীর পানি হবে শোধন।

গল্প

হরিণ ছানার ক্ষমা

নাঈমুল হাসান তানযীম

গভীর বন, ঘন ঝোপঝাড়। নানান প্রজাতির পশুপাখি বাস করে এ বনে। হাতি, বাঘ, সিংহসহ বড়ো বড়ো শক্তিশালী প্রাণী যেমন রয়েছে তেমনই আছে বনমোরগ, হরিণ আর দুর্বল প্রাণীরাও। তবে আনন্দের খবর হলো, এ বনে সবাই সবার বন্ধু। কেউ কাউকে আক্রমণ করে না। কেউ কারো ওপর জুলুম বা অত্যাচার করে না। বনের রাজা সিংহ সুন্দরভাবে পরিচালনা করে তার রাজ্য। সবাই তাই সিংহের ওপর সন্তুষ্ট।

একদিন বিকেলে ঘটল এক দুর্ঘটনা। বনের সব পশুপাখি আপন আপন নীড়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় একটি নির্জন জায়গায় হঠাৎ বাঘ আর হরিণ ছানার দেখা। হরিণ ছানাটি ছিল দেখতে খুব সুন্দর। নাদুসনুদুস। তার ওপর চোখ পড়তেই বাঘ নিজের লোভ সামলাতে পারল না। ডাক দিল,

'ও হরিণ ছানা! শোনো শোনো, কোথায় যাচ্ছ? বলো তো।'

' কোথায় যাব আর। আমাদের বাসায় যাচ্ছি। তা কী উদ্দেশ্যে ডাকলে?'

'উদ্দেশ্য আর কী ভাই, তোমরা তো আমার খোঁজখবরই রাখো না। বেঁচে আছি না মরে গেছি একটু দেখতেও আসো না। তাই আমিই ডাকলাম তোমাদের খোঁজ নিতে।'

'ও আচ্ছা, সে কথা। আছি ভালোই আল্লাহর রহমতে। তোমার কী খবরটবর?'

'আমার আর খবর। বুড়ো হয়ে গেছি। কবে না জানি মরে যাই এ অপেক্ষাতেই দিন কেটে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

'তা এখানে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প না করে এসো আমার আস্তানায় যাই। ওখানে আরামসে বসে বসে গল্প করি অনেকক্ষণ। কী বলো?'

হরিণ ছানার কাছে বাঘের মতিগতি ভালো ঠেকল না। আস্তানায় যাওয়ার জন্য বলা মানে নিশ্চয়ই কোনো ফন্দি আঁটছে মনে মনে। তাছাড়া মায়ের কাছে শুনেছে, যতই বন্ধুত্ব আর ভালো সম্পর্ক থাকুক বাঘকে যেন কখনও বিশ্বাস না করে।

এরই মধ্যে বাঘ বলে উঠল,

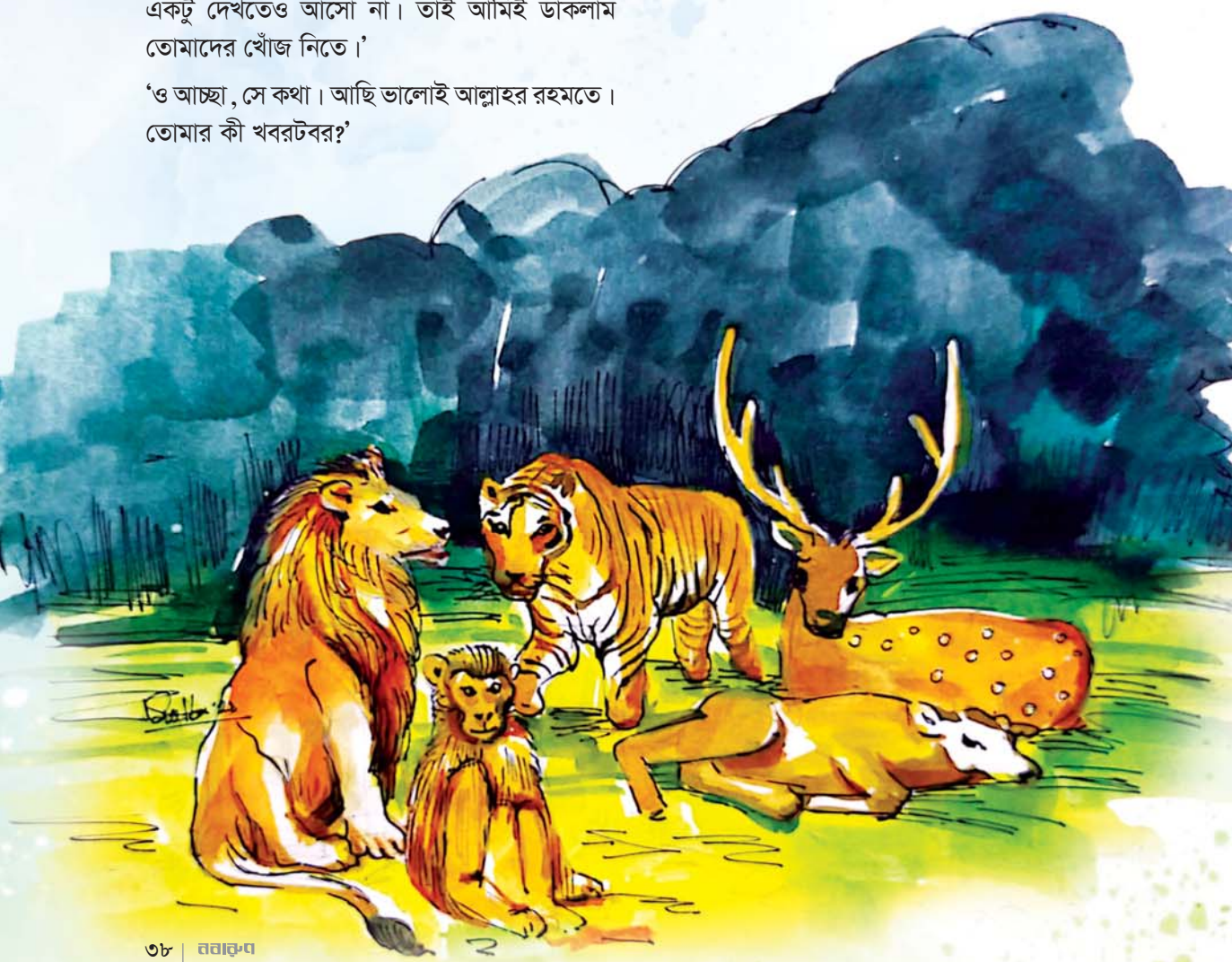

‘কী চিন্তা করছ বন্ধু! আসো না আমাদের আস্তানা থেকে ঘুরে আসি একটু।’

‘না বাঘ ভাইয়া, আরেকদিন আসবোনে সময় করে। আজ সন্ধ্যা হয়ে এল। তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছুতে হবে। নইলে আবার মা বকাঝকা করবে।’

এই বলে হরিণ ছানা সামনে বাড়তে চাইল। কিন্তু বাঘের যেন কিছুতেই তর সইছিল না। নানাভাবে তাকে বুঝিয়ে রাখতে চাইল। কিন্তু হরিণ ছানা নাছোড়বান্দা। সে চলেই যাবে। শেষমেষ বাঘ যখন দেখল, কোনোভাবেই হরিণ ছানাটিকে আটকে রাখতে পারবে না তখন শেষ সুযোগটি সে গ্রহণ করল। প্রথমে আশপাশে একটু চোখ বুলিয়ে নিল। নাহ, কেউ নেই চারপাশে। তারপর মুহূর্তেই ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণ ছানার ওপর। হরিণ ছানা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু মস্ত বড়ো এ হিংস্র প্রাণী থেকে বাঁচা যে কঠিন তা সে জানত। উপায় না পেয়ে জোরে জোরে চিৎকার জুড়ে দিল। আর এতেই কাজ হলো। হরিণ ছানার আর্তনাদ পৌঁছে গেল চতুর্দিকে। মুহূর্তেই নানা পশুপাখি জড়ো হয়ে গেল ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে ছুটে এল বনের রাজা সিংহও।

আচমকা সবার উপস্থিতি টের পেয়ে ভড়কে গেল লোভী বাঘ। হরিণ ছানার মা চিৎকার করতে করতে উদ্ধার করল তাকে। হরিণ ছানার রক্তাক্ত শরীর দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। বনের রাজা সিংহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, অচিরেই বাঘের এহেন কর্মের জন্য কঠিন বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

ইতোমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আসমানে উঠল থালার মতো গোলগাল চাঁদ। চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল পুরো বন। বিচারের বৈঠক।

বাঘকে ঘিরে আছে বনের সব পশুপাখি। সবার চোখেমুখে রাগ আর প্রতিশোধের আগুন। হরিণ ছানার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই অন্যায়ের বিচার চায় সবাই। বিচার না করা পর্যন্ত কেউ সরবে না জায়গা থেকে মোটামুটি এমন সিদ্ধান্তই তাদের।

প্রথমেই বনের রাজা ডাকল আহত হরিণ ছানাকে। জানতে চাইল, তার সঙ্গে কী কী ঘটেছে। হরিণ ছানা দুর্বল কণ্ঠে একে একে খুলে বলল পুরো ঘটনা। পাশেই নিচের দিকে চেয়ে বসে আছে বাঘ। দেখে মনে হচ্ছে, সে তার এহেন কর্মের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত। কিন্তু অন্যায় তো করেই ফেলেছে। এবার বিচার অনুযায়ী যা সিদ্ধান্ত হবে তাই মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। কিছুই করার নেই। বনের রাজা বাঘকে জিজ্ঞেস করল,

‘হরিণ ছানা যা যা বলেছে তা কি সত্য?’

বাঘ নিচের দিকে চেয়েই উত্তর দিল,

‘হ্যাঁ, সত্য।’

বনের রাজা পুনরায় জিজ্ঞেস করল,

‘নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তুমি তার ওপর এমন জুলুম করতে গেলে কেন?’

কাঁদো কাঁদো গলায় বাঘের উত্তর,

‘আসলে আমি হরিণ ছানাটিকে দেখে নিজের লোভকে সামলাতে পারছিলাম না। তাই এমন জঘন্য অপরাধটি করে ফেলেছি।’

‘অপরাধের সাজাস্বরূপ তোমাকে যে শাস্তিই দেওয়া হবে তুমি কি তা মাথা পেতে মেনে নিতে প্রস্তুত?’

‘জি, প্রস্তুত।’

বনের সব পশুপাখি ভীষণ কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে, কী শাস্তি না জানি জোটে বাঘের কপালে। সবার চাওয়া, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই যেন হয়। যেন দ্বিতীয়বার কারো ওপর এমন জুলুম করার দুঃসাহস দেখাতে না পারে বাঘ।

বনের রাজা ডাকল শিয়াল পণ্ডিতকে। বলল, বাঘের ওপর কি শাস্তি প্রয়োগ করা হবে তা যেন দাঁড়িয়ে জোরে জোরে পাঠ করে শোনায় সকলকে।

রাজার আদেশ পেয়ে শিয়াল পণ্ডিত দাঁড়ালো লম্বা একটি পাতা নিয়ে। পড়তে শুরু করল,

‘বনের সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হরিণ ছানার ওপর বাঘের আজকের এই জুলুম

আমাদেরকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে। বনের রাজার আদেশ অমান্য করে এই অন্যায় কাজ ঘটাবার দায়ে বাঘকে সবার সামনে একশবার কান ধরে ওঠবস করতে হবে। তারপর হরিণ ছানার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে। অতঃপর এই বন থেকে চিরতরে তাকে বের হয়ে অন্য কোনো বনে চলে যেতে হবে।

ঘোষণাটি শেষ হলো।'

শিয়াল পণ্ডিতের পাঠ করা শেষ হলে পশুপাখি সকলে করতালি দিয়ে উঠল। কিন্তু হাউমাউ করে কেঁদে উঠল বাঘ। কারণ, প্রথম দুটি বিষয় মেনে নিতে পারলেও শেষের বিষয়টা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এই বন ছেড়ে সে অন্য কোথায় যাবে! জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ বনেই যে তার জীবনযাপন। সেজন্য সে কাকুতিমিনতি করতে লাগল বনের রাজা সিংহের কাছে। এ বিষয়টা যেন একটু ছাড় দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু সিংহ তার সিদ্ধান্তে অটল। এক পা-ও পিছু হটতে রাজি নয় সে।

এরপর যা ঘটল তা যেন সত্যিই অবিশ্বাস্য। বাস্তবতাকেও হার মানায় এমন ঘটনা। সবাই চুপচাপ বসে আছে বাঘের সাজা দেখার জন্য। এমন সময় আহত হরিণ ছানা ছুটে এল বনের রাজার কাছে। বলল, 'আমার ওপর করা বাঘের এই অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম। আমি বাঘের কোনো শাস্তি চাই না। আশা করব, সে দ্বিতীয়বার আর কারও ওপর এমন জুলুম করবে না।' এ বলে হরিণ ছানা তার বক্তব্য শেষ করল।

হরিণ ছানার এমন সিদ্ধান্ত শুনে বনের সব পশুপাখি যেন আসমান থেকে পড়ল। তারা অবাক হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

বাঘ নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে হরিণ ছানার কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

পুরো বনের মধ্যে হরিণ ছানার ক্ষমার এই ঘটনা সাড়া পড়ে গেল। বনের সব পশুপাখির মুখে তার এই মহৎ গুণের প্রশংসার কথা আলোচনা হতে থাকল। ❑

গল্পকার

তিনি বাবা

আজহার মাহমুদ

তিনি বাবা, পৃথিবীর সবচেয়ে সবল
গাড়ি লাগে না তাঁর, পা থাকে সচল
কাজ শেষে ঘরে ফিরেন বাজার নিয়ে
ফেরার পরে গোসল সারেন সাবান দিয়ে।

জুতো জোড়া হয় না কখনও পুরান
লাগে না তার শার্ট, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি
বছরের পর বছর পার হয়ে যায়
পুরাতন জামাগুলোই তার সঙ্গী।

বাবা

মো. কাউসার আহমেদ

বাবার মতো এত আপন
দুনিয়াতে আর কেউ নাই
সন্তানের প্রতি ভালোবাসায়
তার কোনো সীমা নাই।

বিপদে আপদে থাকেন তিনি
বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে
নিজের কষ্ট চাপা দিয়ে
বাবা যান সব সয়ে।

কত আবদার কত চাওয়া
করছেন তিনি পূরণ
শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়
করব তাকে স্মরণ।

[অষ্টম শ্রেণি, মানিকনগর মডেল হাই স্কুল, ঢাকা]

গল্প

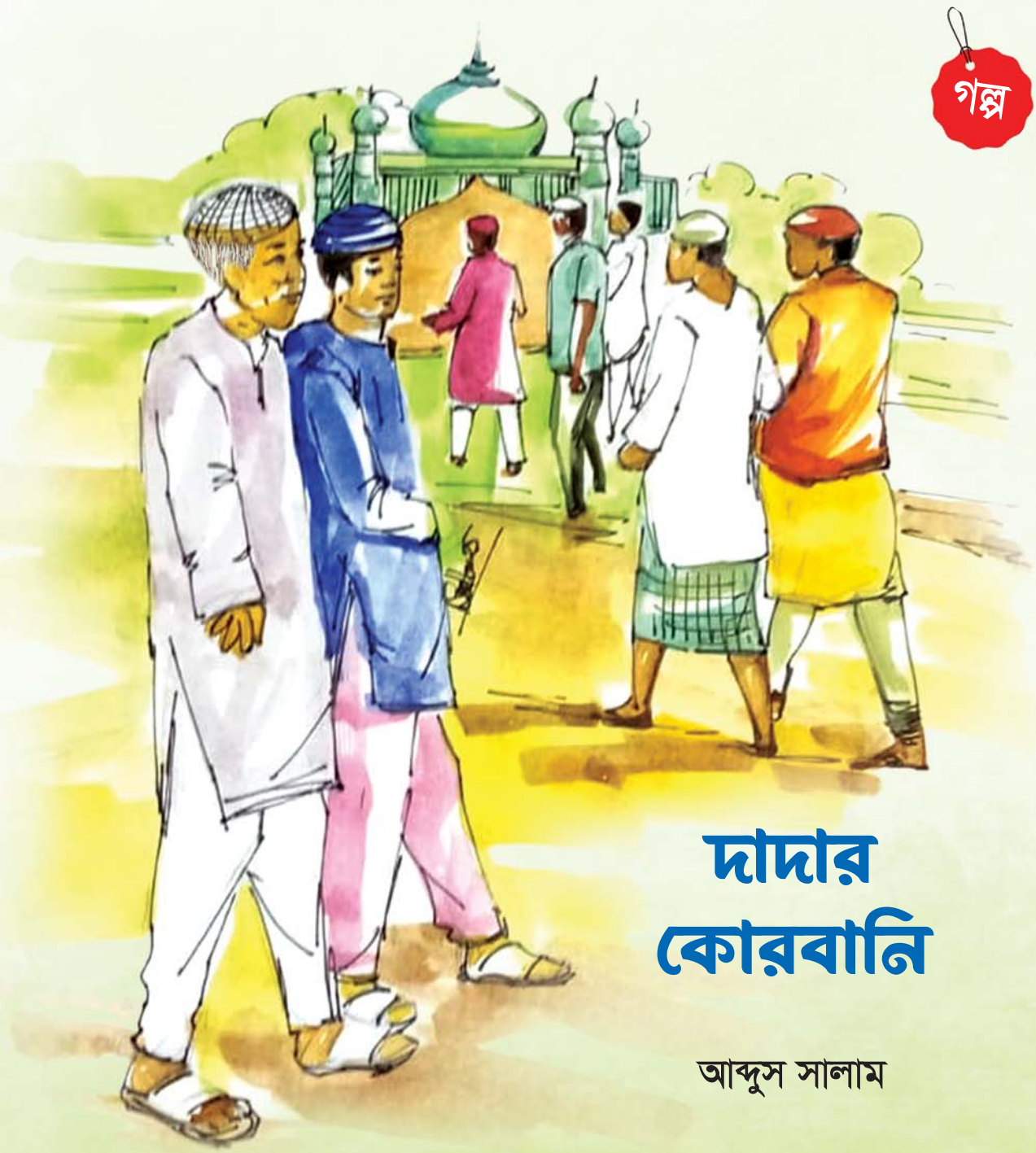

দাদার কোরবানি

আব্দুস সালাম

রাকিবের অনুরোধে বাবা আব্দুল কাদির এবারও কোরবানির ঈদে সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে গেলেন। তার দাদা প্রতি বারের মতো এবারও একটি গরু কোরবানি দেবেন। দেখতে দেখতে কোরবানির ঈদের দিন এসে গেল। ঈদের দুই দিন আগেই কাদির সাহেব গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালেন।

রাকিবকে পেয়ে তার চাচাতো ও ফুফাতো ভাইবোনেরা খুব খুশি হলো। রাকিব ক্লাস থ্রিতে পড়ে। অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, পড়াশোনার চাপ নেই। তাছাড়া ঈদের জন্য স্কুল এক সপ্তাহ ছুটি থাকবে। ঈদের কয়েকটা দিন সে ভালোভাবে গ্রামে কাটাতে পারবে। গ্রামের মেঠো পথ, নদীনালা, মাঠঘাট, গাছপালা সবকিছুই তার খুব ভালো লাগে।

আগামীকাল কোরবানির ঈদ। রাকিবকে খুব ভোরে উঠতে হবে, কারণ সে দাদার সঙ্গে ঈদগাহে গিয়ে নামাজ পড়বে। তাই সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরবেলা রাকিব ঘুম থেকে উঠে পড়ল। তার সমবয়সি চাচাতো ও ফুফাতো ভাইবোনেরাও উঠে গেল। যে গরুটি কোরবানি দেওয়া হবে, তা আমগাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। নামাজের পর কোরবানি দেওয়া হবে। দাদার সঙ্গে রাকিব ঈদগাহে গেল। দাদার সঙ্গে বাবা, ছোটো চাচা এবং বড়ো চাচাও গেলেন। একসাথে ঈদের নামাজ পড়তে সবার ভালো লাগল। যাওয়ার সময় দাদা যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, ফেরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফিরলেন।

গরু কোরবানির প্রস্তুতি শুরু হলো। রাকিব ছোটো বলে কোরবানির দৃশ্য দেখতে দেওয়া হয়নি। তবে মাংস কাটার সময় তাকে দেখতে দেওয়া হলো। দাদার সঙ্গে সে কাজ করছিল। মাঝে মাঝে দাদা যখন কোনো কাজ করতে বলেন, তখন তার খুব ভালো লাগে। দুপুরের আগেই মাংস কাটার কাজ শেষ হয়ে গেল। দাদা মাংসগুলো তিনভাগে ভাগ করলেন- একভাগ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্য, একভাগ গরিব-দুঃখীদের জন্য, আর একভাগ নিজের পরিবারের জন্য।

কোরবানির মাংস নেওয়ার জন্য দাদার বাড়িতে বেশ কয়েকজন গরিব মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল। দাদার সঙ্গে রাকিব মাংসগুলো তাদের মাঝে বিলিয়ে দিল। এরপর চাচাতো ভাইদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতেও মাংস পৌঁছে দিল। রাকিব

লক্ষ করল, দাদা নিজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাংস রেখে বাকি সব গরিবদের দিয়ে দিলেন।

ঈদের ক'টা দিন রাকিব গ্রামে কাটালো। ছুটি শেষে বাবা-মার সঙ্গে সে ঢাকায় ফিরে এল। বাবা রাকিবকে জিজ্ঞেস করলেন,

'কোরবানির ঈদ কেমন কাটল তোমার?'

রাকিব হেসে বলল,

'খুব ভালো লেগেছে, বাবা। তবে জানো, দাদা কত বোকা! কোরবানির সব মাংস ফ্রিজে না রেখে গরিবদের দিয়ে দিলেন!'

বাবা শুনে মৃদু হেসে বললেন,

'না বাবা, তোমার দাদা বোকা নন। তিনি গরিবদের খুব ভালোবাসেন বলেই তাদের মাংস দিয়েছেন। এতে তারা খুশি হয়। তারা তো সারা বছর তেমনভাবে মাংস খেতে পারে না।'

রাকিব বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করল,

'তাহলে তুমি কোরবানির মাংস ফ্রিজ বোঝাই করে রাখো কেন? আম্মা তো অনেক দিন ধরে ফ্রিজে রেখে দেয়!'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

'ঠিক আছে বাবা, এরপর থেকে আর রাখব না।'

রাকিবের চোখে দাদার 'বোকামি' ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক মহৎ শিক্ষা হিসেবে। মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার যে আনন্দ, তা কোনো ফ্রিজে রাখা যায় না। কোরবানি মানে শুধু পশু কোরবানি নয়। কোরবানি মানে ত্যাগ, সহানুভূতি আর ভালোবাসার নিঃস্বার্থ উৎসব। এই উপলব্ধিই রাকিবের মনে বপন করে এক নতুন বোধ, যা তার জীবনের পথে আলো হয়ে জ্বলবে। ❑

সহকারী সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

আমার বাবা

মো. কামরুজ্জামান

বাবার হাতের আঙুল ধরে
প্রথম হাঁটতে শেখা
বাবার কাঁধে চড়ে চড়ে
বাইরের পৃথিবী দেখা।

বাবার হাতের আঙুল ধরে
প্রথম জলে নামা
জল কতটুকু গভীর
সেটা নেই জানা।

ইচ্ছে মতো ঝাঁপিয়েছি
জল তুলেছি উপরে
এত সাহস পেয়েছিলাম
সেদিন বাবা ছিলেন বলে।

বাবা আর ঘুড়ি

আলাউদ্দিন আল-আউয়াল

বাবা আমার বানাতো ঘুড়ি
রঙিন কাগজ দিয়ে,
লম্বা লেজে লেগে হাওয়া
যেত দূর আকাশে উড়ে।

ছুটতাম আমরা মাঠের দিকে
দুজনে হই খুব খুশি,
ঘুড়ি উড়ত আকাশ পানে
ফুটত মুখে আনন্দের হাসি।

আজও ঘুড়ি দেখলে পরে
মনে পড়ে যায় সেদিন,
বাবার সাথে সেই খেলা
থাকবে চির অমলিন।

গল্প

জিন পরিদের আস্তানা

আবদুল লতিফ

কানাই কাঠুরে একবার আন্ধা পুকুর পাড়ে গাছ কাটতে যায়। যেই মাত্র কুড়াল চালায়, অমনি ধাম করে তার গালে প্রচণ্ড জোরে থাপ্পড় বসায় অদৃশ্য কেউ। থাপ্পড় খেয়ে মাথা ঘুরে গাছের গোঁড়ায় বেহুঁশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ পড়ে থাকে কানাই। সেদিন থেকে টানা পনেরো দিন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগেছে সে। আরেকবার কানাইয়ের চাচা পুকুর পাড়ে গাছ কাটার সাহস দেখিয়েছিল। সেবার কুড়াল ছিটকে এসে কানাইয়ের চাচার পায়ে পড়ে পা ভেঙে যায়। তাতে প্রায় তিন মাস হাসপাতালে গড়াগড়ি করতে হয়েছে তাকে। তারপর আর কেউ আন্ধা পুকুর পাড়ের গাছ কাটার সাহস করেনি। এলাকার সবাই জানে এই গাছে জিন-পরিদের আস্তানা আছে। তারাই গাছ কাটতে গেলে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়।

বহু বছর পর গ্রামের মেম্বারের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পুকুর পাড়ের বিশালাকৃতির গাছগুলোর উপর। সে জানত, জিন-পরিরা আগুনকে ভীষণ ভয় পায়। তাই বুদ্ধি করে গাছ কাটা শুরুর আগে গাছের চারপাশে খড়কুটো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে কয়েকটা লম্বা বাঁশের মাথায় নেকরা পেঁচিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। বাঁশের মাথায় জ্বলতে থাকা আগুনের শিখা গাছের মাথা বরাবর পৌঁছে যায়। তখন পুকুর পাড়ের সবচেয়ে বড়ো গাছটা সে কেটে ফেলে।

সেদিন বিকেলেই খেলা শেষে বাড়ি ফেরার পথে মেম্বারের অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া একমাত্র ছেলে রাসেল হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। সবাই বলতে থাকে যে, গাছ কাটার কারণে জিনেরা মেম্বারের ছেলেকে নিয়ে গেছে। এভাবে অনেক দিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা সেই কাটা

গাছের খালি জায়গায়ই কোথা থেকে রাসেল এসে উপস্থিত হয়।

এতদিন কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করলে রাসেল জানায়- তাকে জিনেরা নিয়ে গিয়েছিল। তারপর জিন-পরিদের সাথে কাটানো দিনগুলোর বর্ণনা দেয় সে। বলে, দিনের বেলায় সে জিন-পরিদের সাথে গাছের উপর ঘুমিয়ে থাকত আর রাত হলেই তারা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাতো গাছে গাছে কত রকমের প্রাণী বসবাস করে। দেখা যেত কোনো পাখি বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে কোনো পাখির বাসায় ছানাগুলো মায়ের বুকে ঘুমাচ্ছে। গাছের ফুল-ফল খেয়ে অসংখ্য প্রাণী বেঁচে থাকে। গাছে বসবাস করা প্রাণীগুলোও মানুষ এবং পরিবেশের জন্য বেশ উপকারি।

এক রাতে তারা রাসেলকে নিয়ে দূরের কোনো এক শহরের বিশাল বড়ো একটা হাসপাতালে যায়। সেখানে ঘুরে ঘুরে আইসিইউতে থাকা অক্সিজেন লাগানো রুগীদের দেখিয়ে রাসেলকে বলে– দেখো অক্সিজেন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন দরকার তা পাই গাছ থেকে এবং আমরা যে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি তাও শুষে নেয় গাছ। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সকল প্রাণীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেক উপকার করে থাকে। জিন-পরিরা রাসেলকে এ কথাও বলে দেয় যে, সে যেন তার পরিবার এবং গ্রামের সবাইকে গাছের গুরুত্বের কথা বুঝিয়ে বলে। আরও বলে, রাসেলের বাবা যে গাছটি কেটে ফেলেছে সেখানে যেন নতুন করে গাছের কয়েকটি চারা লাগিয়ে দেয়। অন্যথায় তারা রাসেলের পরিবারের আরও ক্ষতি করবে। এ কথা শোনার পর রাসেলের বাবা পুকুর পাড়ে নতুন করে অনেক গাছ লাগিয়ে দেয়। পাশাপাশি গাছের উপকারিতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে গ্রামের অন্যরাও তাদের বাড়ির সব খালি জায়গায় গাছ লাগিয়ে পরিপূর্ণ করে ফেলে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

কে খাবে আয়

নাজমুস সাদাত

আম ধরেছে, জাম ধরেছে
ছোট্ট পুকুর পাড়ে,
ও সব দেখে অন্তু সোনা
শুধুই জিহ্বা নাড়ে।

ফলফলাদি কত্ত ভালো
খেতে লাগে মজা,
কে খাবে আয় অতিদ্রুত
আমগো বাড়ি সোজা।

রসালো আম ঝরে পড়ে
সোনালি রোদেলা বেলায়,
গাছের ছায়ায় বসে থাকি,
হাওয়ার মিষ্টি মেলায়।

মুকুলের গন্ধে মন ভরে
ডাকে কোকিল কূজন,
গরম দুপুর জামের ছায়ায়
জুড়িয়ে আসে প্রাণ।

[সপ্তম শ্রেণি, আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি বিদ্যানিকেতন, জকিগঞ্জ, সিলেট]

গল্প

আইসক্রিম ভূত

রকিবুল ইসলাম

ফ্রিজ খুলতেই নিয়ন ভীষণ অবাক হলো। ফ্রিজে আইসক্রিম রাখলেই সেটা গায়েব হয়ে যাচ্ছে! ফ্রিজে আইসক্রিম নেই!

কী অবাক ব্যাপার তাই না! পড়ে থাকছে শুধু আইসক্রিমের কাঠি আর প্যাকেট।

নিয়ন ইশকুল থেকে ফেরার পথে আইসক্রিম কিনেছিল। বাসায় এসে খাবার খেয়ে পরে খাবে এজন্য ফ্রিজে রেখেছিল। কিন্তু খাবার খেয়েই বন্ধুদের সাথে খেলতে চলে যায়। আইসক্রিম খেতে একদম ভুলে গেল।

সন্ধ্যায় বাসায় এসে পড়তে বসেছে। এমন সময় আইসক্রিমের কথা মনে পড়ল।

তাড়াতাড়ি ফ্রিজের কাছে গেল। দরজা খুলতেই অবাক! ফ্রিজটা একদম ফাঁকা! পড়ে আছে শুধু আইসক্রিমের কাঠি আর প্যাকেট।

নিয়ন মন খারাপ করে পড়তে বসল।

পরদিন ইশকুলে এসে বন্ধুদের জানালো। আয়ান বলল, নিশ্চয়ই আইসক্রিমটা ভূতে খেয়ে ফেলেছে!

সবাই আয়ানের দিকে তাকালো। ভূত! ভূতে আবার আইসক্রিম খায় নাকি!

আয়ান বলল, আমার মনে হয় ভূতেই তোর আইসক্রিম খেয়ে ফেলেছে। আমার মামার কাছে শুনেছি আইসক্রিম ভূতের কথা।

সবাই অবাক হয়ে আয়ানের কথা শুনতে লাগল।

আয়ান বলল, ফ্রিজের ভেতর লুকিয়ে থাকে ভূত। তারপর সুযোগমতো গাপুসগুপুস করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আইসক্রিম ভূত একদম শিশুদের মতো। আইসক্রিম পেলে আর ঠিক থাকতে পারে না!

নিয়ন বাসায় এসে ভাবতে লাগল। আইসক্রিম ভূত কেমন হতে পারে! ওরা থাকেই বা কোথায়!

কীভাবে ফ্রিজে ঢুকে আইসক্রিম খায়? যেভাবেই হোক ভূতটাকে ধরতেই হবে!

পরের দিন নিয়ন আবারও একটি আইসক্রিম রাখল ফ্রিজে। তারপর ভূতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। একবার ধরতে পারলে পাজি ভূতকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। কিন্তু কোনো ভূতেরই দেখা পেল না। তবে কি পাজি ভূত বিষয়টা জেনে ফেলেছে!

নিয়ন বিরক্ত হয়ে চলে গেল। রাতে আর দেখাই হলো না। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফ্রিজের কাছে গেল। দরজা খুলতেই অবাক!

আবারও খেয়ে গেছে আইসক্রিম। পড়ে আছে শুধু আইসক্রিমের কাঠি আর প্যাকেটটা!

পাজি ভূতের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

বন্ধুদের সঙ্গে আবারও আলাপ করল।

সবকিছু শুনে নিয়ন ও আয়ান গেল বাঁটুল মামার কাছে।

বাঁটুল মামা এলাকার ছোটোখাটো গোয়েন্দা। তার কাছে গেলে নিশ্চয়ই একটা সমাধান পাওয়া যাবে।

বাঁটুল মামা সবকিছু শুনলেন। তারপর হো হো করে হাসতে লাগলেন।

বাঁটুল মামা বললেন, তোমরা পাগল নাকি! জীবনে অনেক ভূতের নাম শুনেছি। কিন্তু আইসক্রিম ভূতের নাম তো কখনও শুনিনি!

বাঁটুল মামা আবারও হাসতে লাগলেন। হো হো হো...

নিয়ন বলল, প্রথমে আমিও সেটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করেন, আমি তিনদিন যাবৎ আইসক্রিম ভূতের নজরে আছি।

বাঁটুল মামা বললেন, ঠিক আছে। তুমি আজ আবার পরীক্ষা করে দেখো। যদি আজও ভূতটা আইসক্রিম খেয়ে যায়, তবে কাল গিয়ে সমাধান দিয়ে আসব।

নিয়ন আজও একটি আইসক্রিম কিনল। বাসায় গিয়ে ফ্রিজ খুলে সাবধানে রেখে দিলো।

সকালে উঠে আবারও অবাক হলো। ফ্রিজে আইসক্রিম নেই! সঙ্গে সঙ্গে আয়ানের কাছে গেল।

আয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বাঁটুল মামার কাছে গেল। বাঁটুল মামাকে জানানো হলো।

বাঁটুল মামা মুখটা গম্ভীর করলেন। তারপর বললেন, চলো দেখি কী করা যায়!

নিয়নের বাসায় তখন কেউ ছিল না। মা-বাবা দুজনেই অফিসে।

বাঁটুল মামা দেখলেন- ফ্রিজে শুধু আইসক্রিমের তিনটা কাঠি আর একটি খালি প্যাকেট পড়ে আছে।

বাঁটুল মামা এবার হাসিমুখে বললেন, বুঝতে পেরেছি।

নিয়ন বলল, কী বুঝতে পেরেছেন মামা?

বাঁটুল মামা বললেন, যা ভেবেছিলাম, তা-ই হয়েছে।

আয়ান বলল, কী ভেবেছিলেন মামা?

বাঁটুল মামা বললেন, আইসক্রিম ভূতের খোঁজ পেয়েছি।

নিয়ন ও আয়ান খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

--- পেয়েছি...

বাঁটুল মামা বললেন, নিয়ন, তোমাদের এই ফ্রিজে বিদ্যুতের কোনো সংযোগ নেই।

নিয়ন অবাক হয়ে হা করে তাকিয়ে থাকল।

বাঁটুল মামা বললেন, এই দেখো লাইনটা খুলে রাখা।

নিয়ন এবার ভীষণ লজ্জা পেয়ে নিচে তাকালো।

এরই মধ্যে নিয়নের মা-বাবা বাসায় এলেন। সবকিছু শুনে তারাও অবাক হলেন।

মা বললেন, ফ্রিজটায় সমস্যা হয়েছে। ইলেক্ট্রিশিয়ান না পেয়ে লাইনটা খুলে রাখা হয়েছে।

বাঁটুল মামা বললেন, আর বিদ্যুতের লাইন না থাকায় আইসক্রিম গলে যেত। তুমি এসে শুধু কাঠি আর প্যাকেট পেতে!

এতদিন ভূত আইসক্রিম খেয়ে ফেলেছে ভেবে আসায় নিয়ন ও আয়ান লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে গেল। ❑

শিশুসাহিত্যিক

ঈদ এবং আমাদের নারী উদ্যোক্তা

অদিতি রিতু

ঈদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি আনন্দ, ঐক্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি উৎসবও বটে। ঈদ একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় গুরুত্ব ছাড়াও ঈদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবসায়িক সময়, বিশেষ করে উদ্যোক্তাদের জন্য। বর্তমানে বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাগণ দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থান তৈরি করেছেন। যা তাদের অধ্যবসায়, সৃজনশীলতা এবং ব্যাবসায়িক সফলতায় দৃশ্যমান।

নারী উদ্যোক্তাদের পথচলা এখন তরুণ সমাজের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। গৃহশিল্প থেকে শুরু করে ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস, ঈদের সাথে সম্পর্কিত পণ্য এবং সেবায় নারী পরিচালিত ব্যাবসাগুলো বিকশিত হয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের হাত ধরে। তারা ব্যাবসায় নতুনত্ব ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ঈদকালীন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে লাভবান হচ্ছেন।

ঈদ বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে এক বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে আসে। এসময় গ্রাহকেরা নতুন পোশাক, গৃহসজ্জা, খাবার এবং উপহার কিনে থাকেন। ঈদে ছোটো এবং বড়ো সকল ব্যাবসায়ীর বিক্রি বৃদ্ধি পায়। নারী উদ্যোক্তারা ঈদকালীন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের সৃজনশীলতা এবং ব্যাবসায়িক বোধ ব্যবহার করে বিশাল সংখ্যক ক্রেতাকে সেবা দিয়ে তাদের নিজস্ব পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।

ঈদে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়া শিল্পগুলোর মধ্যে একটি হলো ফ্যাশন এবং টেক্সটাইল শিল্প। হাতের তৈরি শাড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক পোশাক, নারী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে। অনলাইন বুটিক, সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক দোকান এবং নারীদের মালিকানাধীন ঐতিহ্যবাহী দোকানে এই সময়ে অনেক ভিড় দেখা যায়। এছাড়াও, খাদ্য শিল্প, বিশেষ করে ঘরোয়া মিষ্টান্ন, বেকারি পণ্য এবং ক্যাটারিং পরিসেবায়ও বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈদ উপহারের জন্য হাতে তৈরি গহনা এবং বাড়ির সজ্জা সামগ্রী বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

ফ্যাশন শিল্প বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র। অনেক নারী তাদের ডিজাইনের প্রতি আগ্রহকে সফল ব্যাবসায় রূপান্তরিত করেছেন, ঐতিহ্যবাহী শাড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক

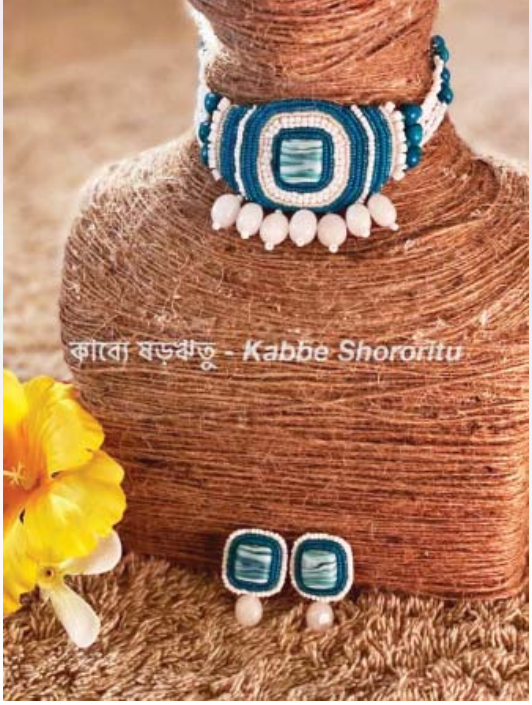

ফিউশন পোশাক পর্যন্ত বিক্রি করছেন। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো নারীদের জন্য একটি সহজ এবং সাশ্রয়ী মাধ্যম, যা তাদের পণ্য বাজারজাত করার জন্য শারীরিকভাবে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে।

স্থানীয় ডিজাইনাররাও নিত্য পণ্য এবং অন্যান্য বুটিক ব্র্যান্ডগুলো অনুপ্রেরণায় উদাহরণ তৈরি করেছে। তবে সত্যিকার সফলতার গল্প আসে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে, যারা বাড়ি থেকে নিজেদের ব্র্যান্ড তৈরি করছেন। তারা কারিগরদের সঙ্গে কাজ করে আকর্ষণীয় ঈদ কালেকশন তৈরি করেন। এ কাজে তারা স্থানীয় কাপড় যেমন- মসলিন, জামদানি এবং সিল্ক ব্যবহার করেন। তাদের এই ব্যাবসা শুধুমাত্র গ্রামীণ কারিগরদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না, বরং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে আধুনিক ফ্যাশনে উন্নতি ঘটায়।

আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনকারী একটি শক্তি হলো ই-কমার্স এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উত্থান। ঈদের কেনাকাটা ভিড়যুক্ত বাজার থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, যা নারী পরিচালিত ব্যাবসাগুলোকে একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করেছে। অনেক নারী যারা একসময় শারীরিক দোকান বা মুখেমুখে বিপণনে নির্ভর করতেন, এখন ফেসবুক পেইজ, ইনস্টাগ্রাম স্টোর এবং ওয়েবসাইটের শক্তি ব্যবহার করে দেশব্যাপী গ্রাহকদের কাছে নিজেদের তৈরি পণ্য পৌঁছাচ্ছেন।

ডিজিটাল পেমেন্ট সল্যুশন যেমন, বিকাশ এবং নগদ ব্যবহার করে নারী উদ্যোক্তারা সহজে লেনদেন করতে সক্ষম হচ্ছেন, যার ফলে গ্রাহকগণ বাড়িতে বসেই কেনাকাটা করতে পারছেন। অনলাইনে ব্যাবসা পরিচালনা করার ক্ষমতা নারীদের জন্য একটি গেমচেঞ্জার, বিশেষত যারা উদ্যোক্তা হওয়ার পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্বও পালন করছেন।

ঈদ উৎসবে খাবার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এখানেও নারী উদ্যোক্তারা ঘরোয়া মিষ্টান্ন এবং ক্যাটারিং পরিসেবা প্রদান করছেন। ঘরোয়া খাবার স্বাস্থ্যকর, হাইজেনিক এবং বাড়িতে তৈরির কারণে সবার কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই ঘরোয়া ব্যাবসাগুলোর প্রতি বিশ্বাস এবং নির্ভরযোগ্যতা অনেক গ্রাহকের কাছে দারুণ পছন্দের বিষয়।

বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শিল্পীদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করেছে তাদের পণ্য বৃহত্তর ক্রেতার কাছে বিক্রির। তাদের তৈরি ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম গ্রাহকের কাছে পছন্দনীয় হয়ে উঠেছে। এই নারীরা সাংস্কৃতিক নান্দনিকতা এবং আধুনিক ডিজাইনকে সংযুক্ত করে, ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে চালু রেখে লাভজনক ব্যাবসা চালাচ্ছেন। ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নতি সত্ত্বেও,

বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তারা নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। সামাজিক প্রত্যাশা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং ব্যাবসায়িক প্রশিক্ষণের অভাব প্রায়ই তাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। অনেক নারী ঋণ এবং বিনিয়োগের সুযোগের সীমিত প্রবাহের কারণে তাদের ব্যাবসার জন্য তহবিল বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন।

অধিকন্তু, একটি ব্যাবসা পরিচালনা করার পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা অনেক কষ্টসাধ্য। শিশু যত্ন সহায়তা, উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র এবং পরামর্শক প্রোগ্রামের অভাব অনেক নারী উদ্যোক্তাকে উদ্বেগের মধ্যে নিমজ্জিত করে। তাছাড়াও নিরাপত্তা উদ্বেগসহ, সাইবার হয়রানি, প্রতারণামূলক ক্রেতা এবং পরিবহণের সমস্যা প্রায়ই নারীদের অনলাইন ব্যাবসায় উপস্থিতি বাড়াতে নিরুৎসাহিত করে। তবে, সরকারি এবং বেসরকারি খাতের নানাবিধ উদ্যোগ, নারীভিত্তিক প্রোগ্রাম, ব্যাবসায়িক অনুদান এবং ডিজিটাল প্রশিক্ষণ অনেক নারীকেই টেকসই ব্যাবসা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ নারী উদ্যোক্তা সংঘের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের সমর্থন এবং পরামর্শ প্রদান করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারী নেতৃত্বাধীন ব্যাবসা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান বিকাশে বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ খুবই আশাব্যঞ্জক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত বিপণন কৌশল, প্রভাবশালী সহযোগিতা এবং অনলাইন ব্যাবসার অটোমেশন নারী পরিচালিত উদ্যোগগুলোকে আরও উন্নতি করতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশাবাদী।

টেকসই বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম সমর্থন যেমন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ব্যাবসায়িক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে যেন নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে আরও অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি, কর্পোরেট খাত এবং সিভিল সোসাইটির সহযোগিতায় এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব যেখানে নারী উদ্যোক্তারা শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী নয়, শিল্পের নেতাও হবেন।

ঈদ বাংলাদেশের অগ্রগতির সাথে নারী উদ্যোক্তাদের সাফল্য তাদের অধ্যবসায়, সৃজনশীলতা এবং আবেগকে লাভে পরিণত করার ক্ষমতার একটি সাক্ষ্য। চলমান সমর্থন এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা শুধু অর্থনীতিতে

অবদান রাখবেন না, বরং পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের স্বপ্ন দেখতে এবং আরও বড়ো কিছু অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করবেন–এটাই সকলের প্রত্যাশা।

নারী উদ্যোক্তা

ফলে ভরা গ্রীষ্মকাল

মনিরা বেগম মিমি

আমাদের ছয়ঋতুর মধ্যে অন্যতম প্রধান ও প্রথম ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাস মিলে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে বাংলার প্রকৃতিতে গাছে গাছে, ফুল-ফলে ভরে যায়। গ্রীষ্মের প্রখর রোদের কারণে গাছে গাছে ফল পাকতে শুরু করে। এর মধ্যে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, তরমুজ, আনারস, তাল, পেঁপে, বেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ফল শুধু স্বাদেই নয়, ভিটামিন এবং পুষ্টিগুণেও ভরপুর। পুষ্টিগুণে ভরপুর কিছু ফল সম্পর্কে জেনে নিই।

ফলের রাজা আম : আমকে বলা হয় ফলের রাজা। কারণ হচ্ছে স্বাদ, পুষ্টি ও গন্ধে আম অতুলনীয়। এ দেশের প্রায় সব জেলাতেই আম হয়। তবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর আম চাষের জন্য বিখ্যাত।

কাঁচা আমে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। পাকা আম ভিটামিন এ, বি, পটাশিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ঠাসা। ত্বক আর চোখের জন্য দারুণ উপকারী আম। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, হজম শক্তি বাড়ায়।

কাঁঠাল : জাতীয় ফল কাঁঠাল আমাদের দেশের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি হয়। তবে ঢাকা জেলার গাজীপুর, টাঙ্গাইল, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, ময়মনসিংহ ও নরসিংদী এলাকায় কাঁঠাল বেশি জন্মে। কাঁঠালে রয়েছে প্রচুর শর্করা, আমিষ ও ভিটামিন-এ। কাঁচা কাঁঠাল তরকারি হিসেবে আর পাকলে ফল হিসেবে খাওয়া যায়। এর দানা ভেজে কিংবা রান্না করে খেতেও মজা।

লিচু : লিচু গরমকালের আরেকটা দারুণ মজাদার ফল। ছোটো এই ফলটি রসালো আর মিষ্টি স্বাদের জন্য খুবই জনপ্রিয়। লিচুতে আছে ভিটামিন সি, কপার, এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। পুষ্টি উপাদানে ভরপুর লিচু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, খালি পেটে বেশি লিচু খাওয়া উচিত না। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যেতে পারে।

তরমুজ : গরমকালে শরীর ঠান্ডা রাখতে তরমুজের জুড়ি নেই। প্রায় ৯২% পানি থাকায় তরমুজ শরীরকে ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচায়। এছাড়াও, তরমুজে আছে ভিটামিন এ, সি এবং লাইকোপিন। তরমুজ চোখের জন্য ভালো,ত্বক উজ্জ্বল করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া তরমুজ শুধু শরীর ঠান্ডা রাখে না, ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকেও রক্ষা করে।

আনারস : টক মিষ্টি স্বাদে ভরপুর আনারস রসালো এবং মজাদার একটি ফল। সিলেট, মৌলভীবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও নরসিংদী জেলায় এই ফল বেশি হয়। পাকা আনারস শক্তি করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হাড় মজবুত করে, আনারস শুধু হজমের জন্য নয়, ত্বককে উজ্জ্বল করতেও সাহায্য করে। এ ফলের শাঁস ও পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে কৃমি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আনারসের জ্যাম-জেলি তৈরি করেও সংরক্ষণ করা যায়।

বেল : ঔষধি গুণে ভরপুর বেল একটি দারুণ উপকারী ফল। এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ক্যালসিয়াম ও ফাইবার। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে বেলের শরবত খুবই জনপ্রিয়। বেল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, চোখ ভালো রাখে, হাড় মজবুত করে, হজম শক্তি বাড়ায়।

জামরুল : রসালো ও হালকা মিষ্টি জামরুল গ্রীষ্মকালেই পাওয়া যায়। এটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। বহুমূত্র রোগীর জন্য জামরুল অনেক উপকারী। বর্তমানে সাদা, খয়েরি-লাল ও হালকা গোলাপি রঙের জামরুল দেখা যায়।

কালোজাম / জাম : কালোজাম বা জাম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব ভালো। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, জামে আছে ভিটামিন সি, আয়রন, পটাশিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

জাম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তশূন্যতা কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। জামের বীজ শুকিয়ে গুঁড়ো করে খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পেঁপে : পেঁপে পেটের জন্য খুবই উপকারী। এতে আছে প্যাপেইন নামক এনজাইম, যা হজমক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও, পেঁপেতে আছে ভিটামিন এ, সি ও ফাইবার। পেঁপে চোখের জন্য ভালো, ত্বক উজ্জ্বল করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে কাঁচা পেঁপে সবজি হিসেবে খাওয়া যায়, আর পাকা পেঁপে ফল হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

এসব ছাড়াও গ্রীষ্মের আরো কিছু ফল রয়েছে যা পুষ্টিগুণে ভরপুর। যেমন- কামরাঙ্গা, লটকন, ফলসা বাঙ্গি, ডেওয়া, চিকু, তাল, ড্রাগন ফল ইত্যাদি। ফলের বহুমাত্রিক ব্যবহার মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই চলে আসছে। এসব ফল শুধু মুখরোচক খাবার হিসেবেই নয়- পুষ্টিগুণ, ওষুধ তৈরিসহ রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার। কিছু ফল সারা বছর পাওয়া গেলেও জ্যৈষ্ঠ মাসে এসব ফল বাজারে আসে বেশি।

ছোট্ট বন্ধুরা. তোমরা প্রতিদিন ফল খাবে এবং দেশি ফল বেশি খাবে, এতে শরীর ভালো থাকবে আর শরীর ভালো থাকলেই তো মন ভালো থাকে।

গ্রীষ্মের গাছে গাছে

সুশান্ত কুমার দে

গ্রীষ্মের গাছে গাছে পাকে লিচু, আম
শাখে শাখে ঝুলে থাকে রসালো জাম।
মিষ্টি রসে টসটসে- গাছের চোখ তাল
কে যাবি মামার বাড়ি- এই আজকাল?

পাখিগুলো গান গায় হরেক সুর তাল
বাদুড় এসে চেপে বসে লিচুর ওই ডাল।
হঠাৎ এল কালবৈশাখি-উঁচু ডাল ভাঙে
নীল আকাশে মেঘগুলো সিঁদুরে রাঙে!

খোকা-খুকি, ছোটাছুটি ওই ঝড়ের সনে
আম কুড়াতে হইচই সারাটা বনে বনে।
কেউ ধরল পাকা আম, কেউ পেলো ভয়
নির্ঝর বৃষ্টির সাথে- কার কার কথা হয়?

ভেজা গায়ে বাড়ি ফেরে ওই দুষ্টু খোকা
লাঠি হাতে মা এসে, হলো এক রোখা।
মায়ের ভয়ে খোকার, দু'চখেই টলমল
পাকা আমের সুঘ্রাণে মায়ের রাগ জল!

৩১ বার এভারেস্ট জয়ের বিশ্বরেকর্ড

বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখার নতুন রেকর্ড গড়লেন নেপালের কামি রিতা শেরপা। নিজের এভারেস্ট জয়ের রেকর্ডকে প্রতিনিয়ত অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ২৭শে মে স্থানীয় সময় ভোর ৪টায় ৩১ বার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন, ভেঙেছেন গত বছরে গড়া নিজের রেকর্ড। তিনি 'এভারেস্ট ম্যান' নামে পরিচিত। ৫৫ বছর বয়সি এ শেরপা প্রথমবার ১৯৯৪ সালে বাণিজ্যিক এক অভিযানে কাজ করতে গিয়ে এভারেস্টে উঠেছিলেন। এরপর থেকে মাঝে তিন বছর এভারেস্টে যেতে পারেননি, ওই সময় বিভিন্ন কারণে সেখানে আরোহণ বন্ধ ছিল।

বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ৮ হাজার ৮৪৯ মিটার (২৯ হাজার ৩২ ফুট)। অভিযানের আয়োজক প্রতিষ্ঠান সেভেন সামিট ট্রেকস এক বিবৃতিতে জানায়, 'কামি রিতার জন্য কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তিনি শুধু আমাদের জাতীয় বীর নন, তিনি এভারেস্টের বৈশ্বিক প্রতীক। ইতিহাসে সর্বাধিক ৩১ বার এভারেস্ট জয়ের অসাধারণ কীর্তির জন্য কিংবদন্তি কামি রিতা শেরপাকে জানাই অভিনন্দন'।

২০২৪ সালে ২৯তম ও ৩০তম সফল অভিযানের পর কামি রিতা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি শুধু কাজ করে যাচ্ছেন। রেকর্ডের কথা ভাবছেন না। রেকর্ড একদিন না একদিন ভাঙবেই। তার এই আরোহণ নেপালকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে বলে তিনি অত্যন্ত খুশি।

যারা পর্বতারোহণকে শুধু ক্রীড়া নয়, জীবনদর্শনের এক নিরীক্ষা মনে করেন, কামি রিতা তাদের কাছে এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। নেপালের সলুখুম্বু জেলার থামি গ্রামে জন্ম তার। শৈশব থেকেই তার পরিবার শেরপা গাইড হিসেবে কাজ করত আর এ কারণেই তিনিও পেশাদার শেরপা হয়ে ওঠেন। তার এই দীর্ঘ পর্বতারোহণ-জীবনে শুধু এভারেস্টই নয়; পৃথিবীর অন্যান্য উচ্চতম পর্বত যেমন চো ইয়ু, লোৎসে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ইত্যাদিতেও সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

কামি রিতার পর সবচেয়ে বেশি ২৯ বার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন আরেক শেরপা পাসাং দাওয়া। শেরপা নন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ব্রিটিশ গাইড কেন্টন কুল সর্বোচ্চ ১৯ বার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন। তার পরই ১৫ বার করে এভারেস্ট জয় করেছেন মার্কিন পর্বতারোহী ডেভ হান ও গ্যারেট ম্যাডিসন। বিশ্বের ১৪ টি সুউচ্চ শৃঙ্গের ৮টিই নেপালে অবস্থিত। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম খাত পর্বতারোহণ ও ট্র্যাকিং-সংশ্লিষ্ট পর্যটন। দেশটির অর্থনীতি পর্যটন শিল্পের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

প্রতিবেদন: আরিফুল ইসলাম

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়

মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো পশু কোরবানি করা। এদিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতার অভাবে পশুর রক্ত ও উচ্ছিষ্টাংশ থেকে মারাত্মক পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা রয়ে যায়। আর বর্জ্য থেকে বিভিন্ন রোগবালাই ছড়িয়ে পরার আশঙ্কা থাকে। এজন্য পশু কোরবানির পর সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আমাদের সবারই নজর দিতে হবে। বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যদি কোরবানির পশুর বর্জ্য যথাযথভাবে পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

অনেক সময় আমরা কোরবানির পশুর দেহের কিছু হাড়গোড়, নাড়িভুড়ি যা খাওয়ার উপযোগী নয় এমন অংশবিশেষও যেখানে-সেখানে ফেলে রাখি। নগর পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দৃষ্টিগোচর না হলে সেসব অংশ পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। নগর কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রতি কোরবানির ঈদের আগে বর্জ্য অপসারণ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়, জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালায়। তাছাড়া সংবাদপত্র, টেলিভিশনসহ প্রায় সব গণমাধ্যমেই কমবেশি প্রচারণা চালানো হয়। এসব প্রচারণার প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখে যদি কোরবানির বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনায় আনা যায়, তাহলে পরিবেশ থাকবে দূষণমুক্ত, জনস্বাস্থ্যও থাকবে নিরাপদ।

বর্জ্য অপসারণ করার একটি উপায় হলো- কোরবানির আগেই বাড়ির পাশে কোনো মাঠে কিংবা পরিত্যক্ত জায়গায় একটি গর্ত খুঁড়ে রাখা। কোরবানির পর পশুর বর্জ্য সেখানে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া। জীবাণু যেন ছড়াতে না পারে সেজন্য নোংরা জায়গা পরিষ্কারের সময় ব্লিচিং পাউডার বা জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। তবে যেসব এলাকায় গর্ত খোঁড়ার উপযুক্ত জায়গা নেই, সেসব এলাকার বর্জ্য প্রচলিত উপায়ে অপসারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার দায়িত্বভার কিছুটা হলেও কমবে।

বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে সচেতনতার পাশাপাশি কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

১. যারা নিজেদের বাড়িতে বা লনে কোরবানি করবেন, তাদের অবশ্যই নিজ দায়িত্বে বর্জ্য পরিষ্কার করতে হবে।

২. এককভাবে কোরবানি না করে মহল্লাভিত্তিক একটি নির্ধারিত স্থানে করা যেতে পারে। এতে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সম্মিলিতভাবে বর্জ্য অপসারণও সহজ হয়।

৩. কোরবানির পর একই ভবনের বেশ কয়েকটি পরিবার মিলে একটি সোসাইটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন- সবাই মিলে বর্জ্য অপসারণের জন্য লোক ঠিক করা যেতে পারে, যারা কোরবানির পর পরই বর্জ্য সরিয়ে নিয়ে যাবে।

৪. কোরবানি করা পশুর গোবর ও উচ্ছিষ্ট আলাদা করে খোলাভাবে না ফেলে সেগুলো ব্যাগে ভরে নির্ধারিত স্থান যেমন নিকটস্থ ডাস্টবিন বা কনটেইনারে ফেলতে হবে। সেখান থেকে যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বর্জ্য সহজেই সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়।

৫. পশু কোরবানির স্থানে কোরবানির পর পশুর রক্ত জীবাণুনাশক পানি দিয়ে ধুয়ে ব্লিচিং ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে করে দুর্গন্ধ বা জমে থাকা পানিতে মশা ডিম পাড়তে না পারে।

কোরবানির পর সচেতনতাই পারে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হিসেবে বজায় রাখতে। পাশাপাশি যেন শুধু পশু কোরবানির মাধ্যমেই 'ত্যাগ' শব্দটি সীমাবদ্ধ না রাখি। আমাদের ত্যাগের মহিমা যেন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক হয়; সেদিকেও নজর রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

মাইশা আক্তার, চতুর্থ শ্রেণি, মডার্ন স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা

৪০০ বছরের গাছ

শফিউল্লাহ সুমন

পৃথিবীতে রয়েছে শত শত ও হাজার বছরের পুরোনো কত গাছ। আজ এমন এক গাছের কথা বলব যেটি ৪০০ বছরের পুরনো এক বিরল গাছ! গাছটির নাম নাখিজা। কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে ৪ শত বছরের পুরনো এ গাছটি। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ঢোলার হাট ইউনিয়নের বদেশ্বরি হাটে দাঁড়িয়ে আছে গাছটি। এটি একটি বিরল প্রজাতির গাছ, যার উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট এবং প্রশস্ততা প্রায় ৪০ ফুট হতে পারে । এটি বিশেষত দীর্ঘ জীবনকাল এবং শক্তিশালী শিকড়ের জন্য পরিচিত, যা দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকার ক্ষমতা রাখে। এই বিরল নাখিজা গাছটির ফল আর পাতা ডুমুর গাছের মতো। কখনো ফুল ফোটেনি এই ঐতিহাসিক গাছটিতে। ডুমুর গাছের সঙ্গে এই গাছের পাতা ও ফলের অনেক মিল। কিন্তু ফলের আকৃতি ছোটো। হাজার হাজার পাখির আশ্রয়স্থল এই গাছের ডালে। স্থানীয়রা গাছটিকে 'প্রাচীন নিদর্শন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটি এক ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছটি প্রতিদিন দেখতে ছুটে আসে হাজারো দর্শনার্থী। যেমনি গাছটির নাম তেমনি এটি দেখতে অনেক সুন্দর ও সবুজ-শ্যামলে ঘেরা। গাছের ডালে ডালে বসা পাখির কিচিরমিচির ডাক দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে তুলে। জানা যায়, গ্রামের লোকজন একে 'নাকিজা' নামে ডাকে। কেউ কেউ আবার 'নাগড়ি গাছ' নামেও ডাকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নাখিজার গাছ একটি প্রাচীন প্রজাতি, যা সাধারণত উষ্ণ অঞ্চলগুলোতে পাওয়া যায়। এই গাছটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে, এটি আরও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ হতে পারে। নাখিজার গাছটির প্রাকৃতিক অবস্থান এবং এর বিভিন্ন ঔষধি গুণের কারণে এটি ভবিষ্যতে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। এই ধরনের বিরল গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। ঠাকুরগাঁওয়ের এই ঐতিহাসিক নাখিজার গাছটি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, এটি গ্রামের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য অংশ হিসেবেও পরিচিত।

খাগড়াছড়ির নিউজিল্যান্ড

স্বপ্নের দেশ নিউজিল্যান্ড। পর্বতে ঘেরা গাঢ় সবুজের দেশ নিউজিল্যান্ড। হয়ত অনেকের মনেই নিউজিল্যান্ড দেখার শখ রয়েছে। সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য তো সবার হয় না। তবে বাংলাদেশের মধ্যেই যে রয়েছে নিউজিল্যান্ড তা কি তোমরা জানো? না বন্ধুরা, রসিকতা নয়, সত্যি! আর সেই নিউজিল্যান্ড রয়েছে বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলা শহরে। এখানকারই একটি জায়গার নাম নিউজিল্যান্ড পাড়া।

খাগড়াছড়ি শহরের কেন্দ্রস্থল শাপলা চত্বর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে পানখাইয়া পাড়া। এই পানখাইয়া পাড়ার সীমানা ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে 'নিউজিল্যান্ড পাড়া'। পানখাইয়া পাড়া থেকে আপার পেরাছড়া গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটি পরিচিত 'নিউজিল্যান্ড সড়ক' নামে।

এই সড়ক আর চারপাশের প্রকৃতি এতটাই মনোমুগ্ধকর, যে একসময় এক পাহাড়ি ভদ্রলোক রসিকতা করে বলেছিলেন, 'এই হাওয়া তো একেবারে নিউজিল্যান্ডের মতো!' তারপর থেকেই এলাকাবাসী এই জায়গাটির নাম দিয়েছে 'নিউজিল্যান্ড'। কথিত আছে, ১৯৯৮ বা ১৯৯৯ সালের দিকে যখন জমির মাঝখান দিয়ে কার্পেটিং সড়কটি তৈরি হয়, তখন প্রতিদিন বিকেল হলেই মানুষ দলবেঁধে ঘুরতে আসতেন এই এলাকায়। সড়কের দু'পাশে বিস্তৃত ধানক্ষেত, দূরে পাহাড়ের সারি আর হালকা বাতাসে দুলতে থাকা ফসলের ঢেউ। সব মিলিয়ে অনন্য এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

নিউজিল্যান্ড পাড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি খাগড়াছড়ি শহরের একমাত্র সমতল ভূমি ও ধান্য জমির বিল। এখানে রয়েছে শস্যের সবুজ গালিচা, পাশে গাছগাছালি, দূরে পাহাড়-এক নিটোল প্রকৃতি যেন হাতছানি দেয়। নিউজিল্যান্ড পাড়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় রূপ হচ্ছে সড়কের ওপর বসে বর্ষার সময় আলুটিলা পাহাড়ের মেঘের ভেলা দেখা। এখানে শুধু পাহাড় আর সবুজ প্রকৃতিই নয়, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তও দেখা যায়। আর ধান পাকলে ধানের ক্ষেতে নামে শত শত টিয়াপাখি, যা প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাহাড়ি জনপদের জীবনযাপনের পদ্ধতিও কাছ থেকে দেখা যায়।

নিউজিল্যান্ড পাড়া যেতে হলে- ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি বাসে করে যাওয়া যায় খাগড়াছড়ি শহরে। খাগড়াছড়ি পৌঁছে শহরের শাপলা চত্বর থেকে সিএনজি বা অটোরিকশা নিয়ে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় নিউজিল্যান্ড পাড়ায়।

বন্ধুরা, তোমরা খাগড়াছড়ি ঘুরতে গেলে অবশ্যই নিউজিল্যান্ড পাড়া ঘুরে আসবে।

প্রতিবেদন: ওবায়েদুর রহমান

কুইলিং: এক কাগজের খেলা

নবারুণের বন্ধুরা, তোমরা কি জানো কুইলিং মানে কী? নিশ্চয়ই জানো। আমি কিন্তু জানতাম না, কিছুদিন আগে জানলাম। তাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই।

কুইলিং এক ধরনের পেপার ক্রাফটিং। সুতা বা ফিতার মতো লম্বা, চিকন রঙিন কাগজকে প্যাঁচিয়ে রোল করে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি দেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের জিনিস বানানো ও সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয় এগুলো। আর এটাই হচ্ছে কুইলিং। বিভিন্ন ধরনের কার্ড, শো-পিস, চাবির রিং,বক্স, জুয়েলারি, ফটোফ্রেম ইত্যাদি তৈরি ও অলংকরণে একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে কুইলিং। পাখি, প্রজাপতি, মাছ, নৌকা, ফুল, বই কিংবা গহনা - সবই বানানো যায় এক টুকরো কাগজ দিয়ে। কি মজা না?

এবার চলো দেখি, আমাদের সিলেটের মেয়ে শ্রাবন্তী সন্ধ্যা সিকদার কীভাবে এই কুইলিং-এ সাফল্য পেলো।

শ্রাবন্তী কুইলিং শুরু করেন ২০১৭ সালে। তবে ছোটোবেলা থেকেই টুকিটাকি আঁকাআঁকি, ওরিগ্যামি, ক্রাফটিং করার প্রতি আগ্রহ ছিল তার। যখন যে ক্রাফটের ছবি দেখতেন, সাথে সাথে বানানোর চেষ্টা করতেন হাতের কাছে থাকা জিনিস দিয়ে। অনলাইনের মাধ্যমে কুইলিংয়ের ছবি দেখে আগ্রহ জন্মে শ্রাবন্তীর। তখন কুইলিংয়ের টুলস সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তার। অন্য একজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে ছোট্ট একটি ওয়ালম্যাট বানিয়েছিলেন তিনি। এটিই ছিল তার প্রথম কাজ। সেই থেকে কুইলিংয়ে যাত্রা শুরু।

শ্রাবন্তী যে-কোনো ক্রাফটিংয়ের কাজ করার পর ফেসবুকে শেয়ার করতেন। তখন বন্ধু তালিকায় যারা আছেন তারা প্রশংসা করতেন, উৎসাহ দিতেন। উৎসাহ পেয়ে শ্রাবন্তীর এ কাজের প্রতি আগ্রহ আরো বহুগুণ বেড়ে যেত। এভাবে কুইলিং হয়ে উঠল ওর প্রতিদিনের সঙ্গী। এখন ওকে দেখে উৎসাহিত হয়ে অনেকে কুইলিং করছে।

'হ্যাপিনেস ২০২৫ গ্রুপ এক্সিবিশন'-নামক আন্তর্জাতিক অনলাইন প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শ্রাবন্তীর কুইলিং। 'Robin's Nest' নামের বিদেশি ডিজাইন টিম ও 'Indian Quilling Challenge' -এর ডিজাইন টিমে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তার। 'পিঁপড়ের দল' নামক ই-ম্যাগাজিনেও কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া বিভিন্ন সময় অনলাইন কনটেস্টে অংশগ্রহণ করে পেয়েছেন সম্মাননা।

শ্রাবন্তী সন্ধ্যা নিজের ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউব চ্যানেল (Tale of quilling) থেকে কাজ ও ভিডিও নিয়মিত শেয়ার করছেন। তাছাড়া কেউ যদি কুইলিং শুরু করতে চায় তাহলে যেন এখান থেকেই ছোটোখাটো গাইডলাইন পেয়ে যায় - এই চেষ্টাও করছেন তিনি। কুইলিংয়ের কাজগুলো আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য স্টুডিওর কাজও শুরু করেছেন শ্রাবন্তী।

উল্লেখ্য, শ্রাবন্তী সন্ধ্যা সিকদারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা সিলেটে। পড়ালেখা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন তিনি।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বোতল বাড়ি

প্লাস্টিকের বোতলের পানি ও কোমল পানীয় পান করে আমরা ফেলে দেই, তাই না। কিন্তু এই প্লাস্টিকের রঙ-বেরঙের পরিত্যক্ত বোতল দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন বাড়ি। প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সুন্দরগঞ্জের অটোরিকশাচালক আব্দুল হাকিম। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ছাপড়হাটী ইউনিয়নের পশ্চিম ছাপড়হাটী খানপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা তিনি। পরিত্যক্ত বিভিন্ন প্লাস্টিকের বোতলে বালু ভরে এরপর তা ব্যবহার করা হয়েছে তার বাড়ির দেয়াল তৈরিতে। ইটের বদলে সারি সারি প্লাস্টিকের বোতলে সিমেন্টের গাঁথুনি দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে এসব দেয়াল। শখ করে এলাকাবাসী বাড়িটির নাম দিয়েছে 'বোতল বাড়ি'। বাড়িটি নির্মাণে খরচও পড়েছে কিছুটা কম। প্রথম প্রথম বোতল দিয়ে বাড়ি নির্মাণের এমন পদ্ধতি দেখে সকলে হাসি-তামাশা করলেও এখন বাড়িটি নিয়ে গর্ব করছে স্থানীয়রা। বৈচিত্র্যময় এ বাড়িটি দেখতে প্রতিনিয়ত দূরদূরান্ত থেকে অনেক লোক আসে। আব্দুল হাকিম জানান, তার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ব্যতিক্রমী কিছু করার। ইউটিউবে বোতলের বাড়ি নির্মাণ করা দেখে বিভিন্ন ভাঙারির দোকান থেকে পরিত্যক্ত বোতল সংগ্রহ করেন তিনি। এরপর সিমেন্ট, বালু ম্যানেজ করে কাজ শুরু করেন। অভিনব পদ্ধতিতে বাড়ি নির্মাণের কাজ করতে পেরে খুশি রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিকরাও। আব্দুল হাকিমের বোতল বাড়ির আশেপাশে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারিসহ বিভিন্ন প্রজাতির অনেক গাছ রয়েছে। প্লাস্টিক পরিবেশ দূষণ করে। কিন্তু সেই প্লাস্টিককে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগিয়ে বাড়ি তৈরি করা হলে তা হতে পারে পরিবেশবান্ধব।

পর্বত পেলো আইনি অধিকার

পর্বতকে দেওয়া হয়েছে মানুষের সমান আইনি অধিকার! এমনটাও কি হয়? হ্যাঁ, ঘটনাটি সত্যি! দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের একটি পর্বতকে মানুষের সমান আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। মূলত মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি যে যে অধিকার পেয়ে থাকেন নিউজিল্যান্ডের ওই পর্বতকে একই আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। নিউজিল্যান্ডের ওই পর্বতের নাম 'মাউন্ট তারানাকি'। স্থানীয় মাওরি জনগোষ্ঠী বরাবরই মাউন্ট তারানাকি নামের এই পর্বতকে তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করে থাকে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের কাছ থেকে এই পবিত্র ভূমি কেড়ে নিয়েছিল। মূলত মাওরি জনগণের বিরুদ্ধে উপনিবেশ আমলের অন্যায়ের স্বীকৃতি ও অবিচারের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই আইনটি করা হয়েছে। নতুন আইনি অধিকার তারানাকি পর্বতটির স্বাস্থ্য ও সুস্থতা রক্ষা করতে সাহায্য করবে। এর ফলে, কেউ চাইলেই ওই অঞ্চলটির ভূমি জোর করে কিনতে পারবে না।

নতুন আইন অনুযায়ী, তারানাকি পর্বতের মানব সত্তার নাম দেওয়া হয়েছে 'তে কাহুই তুপুয়া'। আইনিভাবে এখন এই পর্বত ও তার আশপাশের ভূমিকে একটি জীবন্ত ও অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে গণ্য করা হবে। এতে পর্বতটির সংরক্ষণ, ঐতিহ্যগত ব্যবহার ও এর সুস্থতা রক্ষার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়া নিউজিল্যান্ডই হচ্ছে বিশ্বে প্রথম দেশ, যেখানে প্রকৃতিকে আইনিভাবে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালে 'তে উরেওরা' নামে এক বিশাল বনভূমিকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এরপর ২০১৭ সালে ওয়াঙ্গানুই নদীকেও একই স্বীকৃতি দেয় দেশটি।

প্রতিবেদন: সাবা তাসনিম

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. কোন মাসে পরিবেশ দিবস পালিত হয়, ২. দুর্বল, ৫. তেতাল্লিশের পরবর্তী সংখ্যা, ৭. বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন ভেষজ উদ্ভিদ, ৮. দেহ, ১১. বর্জন, ১২. চড়ুইভাতি

উপর-নিচ: ১. পাদুকা, ৩. শক্ত/ কঠিন, ৪. রাত, ৫. লোহা আকর্ষণকারী পদার্থ, ৬. নগর, ৯. লকলকে জিহ্বাযুক্ত, ১০. স্পষ্টবাদী, ১১. মুখ

■	১.		■	২.	৩.		৪.
■		■	■	■		■	
৫.			৬.	■		■	
	■	■	৭.				■
৮.	৯.			■	■	■	১০.
■		■	■	১১.			
■		■	■		■	■	
১২.					■	■	

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

১	*		+	২	=	
+	■	+	■	+	■	+
	+	২	-		=	৫
-	■	/	■	-	■	-
২	*		-	৩	=	
=	■	=	■	=	■	=
	*	৫	-		=	১০

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: দিয়াশলাই, তামা, মন, জাম্বুরা, নরম, কিশমিশ, শবনম, জাম, কামরা, কড়ই, মাকড়সা

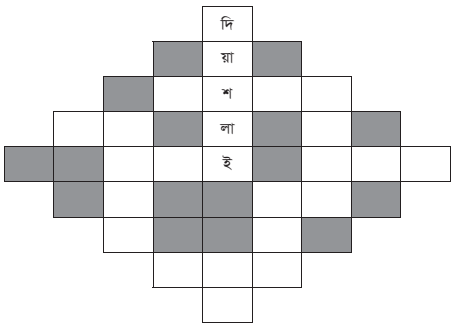

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৯	৮	৭	৬	১	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯
১০	১৩	১৪	৫	২	৫৫	৬২	৬১	৬০
১১	১২	১৫	৪	৩	৫৪	৬৩	৬৪	৬৫
২০	১৯	১৬	৪৭	৪৮	৫৩	৫২	৬৭	৬৬
২১	১৮	১৭	৪৬	৪৯	৫০	৫১	৬৮	৬৯
২২	৩১	৩২	৪৫	৪৪	৪৩	৭৮	৭৯	৭০
২৩	৩০	৩৩	৩৪	৩৫	৪২	৭৭	৮০	৭১
২৪	২৯	২৮	৩৭	৩৬	৪১	৭৬	৮১	৭২
২৫	২৬	২৭	৩৮	৩৯	৪০	৭৫	৭৪	৭৩

মে মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

অ	গ্নি	বী	ণা	■	অ	■	অ
ব	■	■	■	অ	ন্ত	রী	ক্ষ
সা	■	■	অ	■	স্থ	■	য়
ন	■	অ	নু	প	ল	■	লো
■	অ	■	প্রা	■	■	অ	ক
অ	জি	জ্ঞা	স	■	অ	ঙ্গ	■
■	ন	■	■	■	■	ন	■
■	■	অ	প	লা	প	■	■

ছক মিলাও

				দি				
			■	য়া	■			
		■	কি	শ	মি	শ		
	তা	মা	■	লা	■	ব	■	
■	■	ক	ড়	ই	■	ন	র	ম
	■	ড়	■	■	জা	ম	■	
		সা	■	■	ষু	■		
			কা	ম	রা			
				ন				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৯	+	১	-	৪	=	৬
/	■	*	■	-	■	+
৩	*	২	+	১	=	৭
+	■	+	■	+	■	+
৪	*	৩	-	৫	=	৭
=	■	=	■	=	■	=
৭	+	৫	+	৮	=	২০

নাম্ব্রিক্স

৫৩	৫২	৫১	৫০	৪৭	৪৬	৫	৪	৩
৫৪	৫৭	৫৮	৪৯	৪৮	৪৫	৬	৭	২
৫৫	৫৬	৫৯	৪২	৪৩	৪৪	৯	৮	১
৬৪	৬৩	৬০	৪১	৩৮	৩৭	১০	১৫	১৬
৬৫	৬২	৬১	৪০	৩৯	৩৬	১১	১৪	১৭
৬৬	৭৭	৭৬	৭৫	৩৪	৩৫	১২	১৩	১৮
৬৭	৭৮	৮১	৭৪	৩৩	২৮	২৭	২৬	১৯
৬৮	৭৯	৮০	৭৩	৩২	২৯	২৪	২৫	২০
৬৯	৭০	৭১	৭২	৩১	৩০	২৩	২২	২১

ফয়সাল আহমেদ, ষষ্ঠ শ্রেণি, বিদ্যাময়ী স্কুল, ময়মনসিংহ

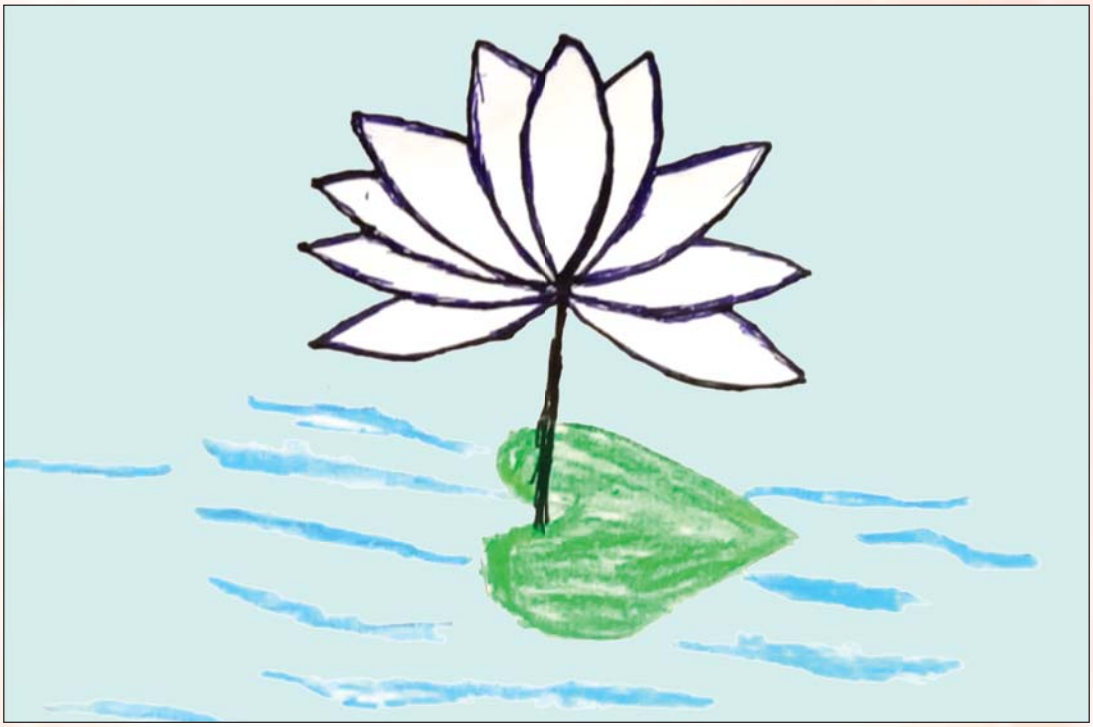

রিজওয়ান আল রাহাত, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্বরলিপি উচ্চ বিদ্যালয়, মুগদা, ঢাকা

শারদ দাস, দ্বিতীয় শ্রেণি, কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

মো. হাসিবুল ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

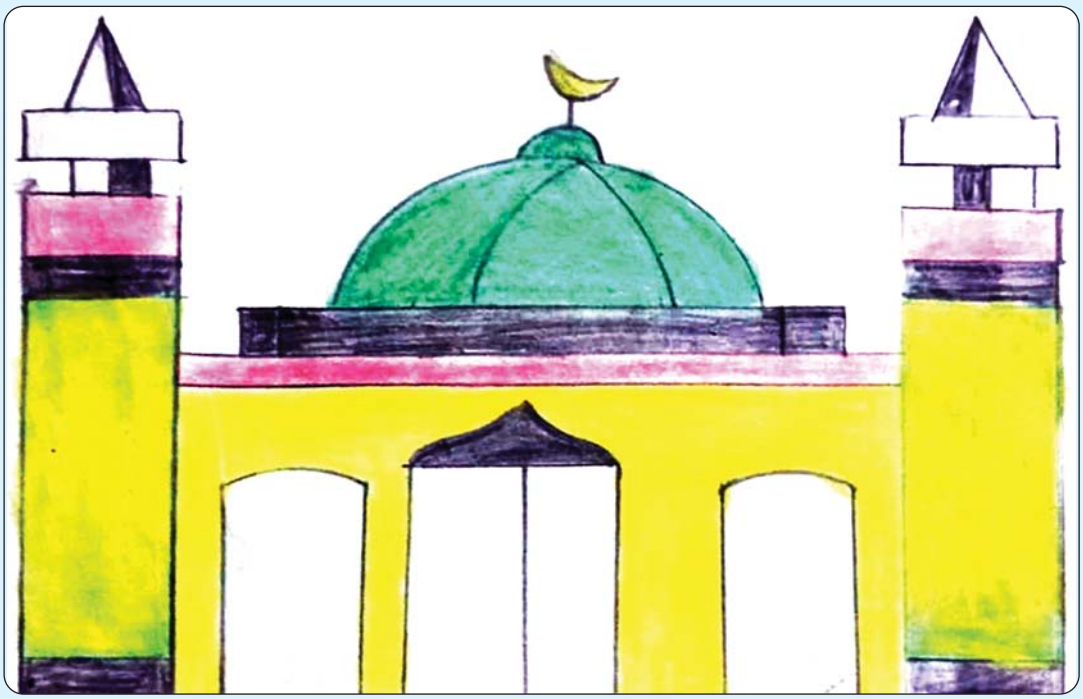

শারিকা তাসনিম নিধি, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজিগঞ্জ মডেল সরকারি গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-12. June 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

মায়মুনা সানজিদা, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা